বসন্তের নেশা

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

সৌখিন প্রকাশনী
২৪এ, বনমালী সরকার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৫

মুদ্রণ—ফাল্গুন ১৩৬৭

প্রকাশক : প্রশান্ত তালুকদার
২৪এ, বনমালী সরকার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৫

প্রচ্ছদ : শচীন বিশ্বাস

মুদ্রাকর : শ্রীচন্দ্রশেখর দে
শ্রীকমলা প্রেস
২৭সি কৈলাস বসু ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

আকাশের উত্তর-পূর্ব কোণ কালো হয়ে আসছে। ঝড় উঠবে। [illegible] উঠবে। হয়তো কালবৈশাখী এগিয়ে আসছে দৃঢ় পদক্ষেপে। [illegible] কাশ-বাতাস ,ধূলি জঞ্জালে পরিকীর্ণ করে দেবে রুদ্র [illegible] আর্তচিৎকারে চরাচর মুখরিত করে তুলবে। [illegible] শিক্ষণ নয়। ঝড় এসে গেছে। মহাশূ[illegible] তাদের আর দেখা যাচ্ছে না। অনেক দূর [illegible] ই এগিয়ে আসছে। ঝড়ের গোঙানি। [illegible] বার বার মাথা নীচু করে প্রণাম জানাচ্ছে। [illegible] দেখা যায়— প্রায় আড়াই শতাব্দীর স্মৃতির সাক্ষ[illegible] স্থবির বনস্পতিটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে—তার শা[illegible]র, পত্র-পল্লবে যেন কিসের শঙ্কিত আন্দোলন।

কালবৈশাখীর প্রমত্ত তাণ্ডব এগিয়ে আসছে। ঝড় উঠবে।

[illegible] কি ঝড়? সেই সঙ্গে বজ্র বিদ্যুতের মাতামাতি। ঝঞ্ঝা-বর্ষণ। [illegible] বাতাস দুরন্ত বেগে বয়ে গেল। জঞ্জালে চারিদিক [illegible] সামনের দেবদারু গাছটা যেন কিসের একটা [illegible] তার পাশের কোন এক গাছ থেকে [illegible] একটা [illegible] মড় মড় শব্দ শোনা গেল। সেই শাখাশ্রয়। [illegible] আর্তচিৎকার করে উঠল। নাঃ! আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় [illegible] দুটো ভরে গেছে। জ্বালা করছে।

কালীগড়ের জমিদার-উত্ত[illegible]রিণী ভানুমতী একটা নিঃশ্বাস মোচন করে চোখে আঁচল দিলেন। ছাদে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। সম্ভবত কারো প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অতীত স্মৃতির রোমন্থন

করছিলেন। রেলিঙে দেহভার স্থাপন করে দাঁড়িয়েছিলেন। দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন দূরে গ্রাম প্রান্তের অস্পষ্ট শ্যামবনরেখার দিকে। ওই বনরেখার পরপারে কালীগড় রেল-ষ্টেশন ছোট রেল। ছোট ষ্টেশন। সমস্ত দিনে রাতে বোধ হয় চার পাঁচখানা ট্রেন কালীগড় ষ্টেশনের ওপর দিয়ে যাওয়া আসা করে।

তা করুক। তাতে কোনো অসুবিধা নেই এ অঞ্চলের লোকদের। তারা ট্রেন না পেলে আর একটু এগিয়ে যায়। এগিয়ে গিয়ে ওই জনক-পুরের নন্দীদের প্রকাণ্ড মাঠটা দেখা যায়, ওরই কোল ঘেঁসে চলে গেছে সরকারী সড়ক। বেশ চওড়া সড়ক, যদিও মেরামতির অভাবে সড়কের অবস্থা মাঝে মাঝে মারাত্মক হয়ে আছে তবুও এরই ওপর দিয়ে গাড়ী ঘোড়া ছোটে মোটর যায়। মালবাহী লরী যায়। খান চারেক যাত্রীবাহী বাসও যায় ধুলো উড়োতে উড়োতে। আর যায় সাইকেল রিক্সা। এটা নতুন চালু হয়েছে।

না। এ অঞ্চলের মানুষদের কোন অসুবিধে নেই শহরে যাওয়া আসার। কতই বা পথ। এখান থেকে মাত্র চল্লিশ মাইল পথ কলকাতা। একদিনে গিয়ে ফিরে আসা চলে। কালীগড় ষ্টেশন থেকে গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের পথ তেমন সুবিধা মতো নেই, এই যা একটু অসুবিধা। তা গাঁয়ের লোকেরা এ অসুবিধা গ্রাহ্যই করে না। তারা পায়ে হেঁটেই যায় আসে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। স[illegible]ন। যায় জনকপুরের সরকারী সড়কে বাস ধরতে। তা ছাড়া [illegible] ছেলে ছোকরাদের প্রত্যেকেরই প্রায় সাইকেল [illegible]। ভানুমতির ছেলে আদিত্যনারায়ণেরও একটা দামী সাইকেল আছে।

আদিত্যের দামী সাইকেল থাকা মোটেই বিচিত্র নয়। একে জমিদার রাজনারায়ণ ভট্টের দৌহিত্র, তায় একমাত্র দৌহিত্র। রাজ-নারায়ণ আজ বছর তিনেক হল স্বর্গারোহণ করেছেন। রাজনারায়ণ অপুত্রক বটে কিন্তু নিঃসন্তান ছিলেন না। ভানুমতী তাঁর একমাত্র

কন্যা ; অত্যন্ত আদরের কন্যা ভানুমতী ছিল তাঁর দৃষ্টিপ্রদীপ বিশেষ। ভানুমতীর অদর্শনে তিনি জগৎসংসার অন্ধকার দেখতেন। সেইজন্যে ভানুমতীকে বড় একটা কাছছাড়া করতে চাইতেন না।

একদা রাজনারায়ণ অতিশয় খেয়ালী জমিদার ছিলেন। বহুপ্রকার চারিত্রিক দোষ তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল। নারী-সুরা-গীত-বাদ্য-নৃত্য না হলে তাঁর দিন চলতো না।

জমিদার বাড়ির দক্ষিণে ওই যে বিশাল ফুলের বাগিচা, আর বাগিচার মধ্যে ওই যে ইট বার করা ছোট বাড়িটা—ওইখানেই যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল রাত্রিগুলি যাপন করেছেন রাজনারায়ণ। অন্দর মহলে তাঁর যাতায়াত ছিল কালেভদ্রে। কিন্তু ভানুমতীর জন্মের পর থেকেই তাঁর স্বভাবের পরিবর্তন হতে থাকে। তারপর যেদিন স্ত্রী মনোরমা তিন বছরের কন্যা ভানুমতীকে তার কোলে তুলে দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, সেইদিন থেকে একেবারেই বদলে গেলেন রাজনারায়ণ। কন্যা ভানুমতীকে নিয়ে জীবনের নতুন পথে পা বাড়ালেন। বাঈজীর নৃত্যগীত বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধুবান্ধবরা অদৃশ্য হল। বাগানবাড়ির আনন্দ কোলাহল থেমে গেল।

রাজনারায়ণ ভানুমতীকে মানুষ করার কাজে মন-নিবিষ্ট করলেন। ভানুমতীকে তিনি লেখাপড়া শেখালেন। রীতিমত ইস্কুল কলেজে পড়িয়ে লেখাপড়া শেখালেন। গান বাজনা শেখালেন. বাড়িতে ওস্তাদ রেখে গান শেখালেন। তারপর বিবাহ দিলেন। বিবাহ দিলেন বটে কিন্তু কন্যাকে কাছ ছাড়া করলেন না। কন্যা জামাতাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

ভানুমতী কখনো শ্বশুরবাড়ি যেতে পায়নি। শ্বশুরবাড়ি বলতে ছিলও না এমন কিছু। শুধু শুনেছেন বীরভূম জেলায় কোন এক অখ্যাত ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁর স্বামীর বাসভূমি ছিল। শরিকদের পীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর শাশুড়ী নাবালক ছেলেটির হাত ধরে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায়

চলে আসেন। সেই থেকে তাঁরা কলকাতাতেই ছিলেন তাঁদের কোন্ এক আত্মীয়ের কাছে। বলরাম সেখান থেকেই লেখাপড়া শেখেন। বি, এ, পাস করেন। এবং পাস করার পর এই কালীগড় ইস্কুলে মাষ্টারী করতে আসেন। মাষ্টারি করতে এসে রাজনারায়ণের সুনজরে পড়েন। যার ফলে ভানুমতির সঙ্গে তার বিবাহ সম্ভব হয়। মেয়ের বিয়েতে প্রচুর খরচ করেছিলেন রাজনরায়ণ। সাতখানা গাঁয়ের লোক সাতদিন ধরে আনন্দ করেছিল ভানুমতীর বিয়েতে। কিন্তু ভানুমতীর কপালক্রমে সে বিয়ে বিশেষ সুখের হয়নি। বিয়ের মাত্র চার বছর পরেই ভানুমতীকে বৈধব্য বরণ করতে হয়। বলরাম হঠাৎ মারা যান।

অনেকের ধারণা বলরাম আত্মহত্যা করেছেন।

অনেকে বলেন—না। হার্টফেল করেছেন।

ঘটনাটা ঘটেছিল আদিত্য জন্মাবার এক বৎসরের মধ্যেই!

রাজনারায়ণ তখনো জীবিত। জামাতার মৃত্যু শোকটা তিনি পরিপাক করতে পারেননি। অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর দীর্ঘ আঠারোটা বছর তিনি পৃথিবীর বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করেছেন বটে কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিকভাবে নয়। মানসিক এবং শারিরীক শক্তি তাঁর নষ্ট হয়ে যায়। মৃত্যুর ক'বছর পূর্ব থেকেই তিনি একেবারেই শয্যা গ্রহণ করেছিলেন। পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন তিনি। নইলে ইদানীং তিনি কালীগড় গ্রামের উন্নতির ব্যাপারে বিশেষরূপে সচেষ্ট হয়েছিলেন। গ্রামের মধ্যে ভালো রাস্তা তৈরী করবেন। জলাশয় খনন করবেন! একটা হাসপাতাল করবেন। ছোট ইস্কুলটাকে বড় করবেন। অর্থাৎ গ্রামবাসীদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করার চেষ্টা করবেন।

আরো একটা শখ ছিল তাঁর। ওই যে বাগানবাড়িটা রয়েছে তাঁর, ওইখানে একটা সুন্দর গানের ইস্কুল করবেন। নাম দেবেন মনোরমা উচ্চাঙ্গ সংগীত বিদ্যালয়। আর সেই বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার ন্যস্ত করবেন বাসুদেব মিশ্রের ওপর।

বাসুদেব মিশ্র। সত্যই গুণী লোক বাসুদেব। যেমন রূপ তেমনি গুণ।

জীবনে অনেক গান শুনেছেন রাজনারায়ণ কিন্তু বাসুদেবের গানের সঙ্গে কারো যেন তুলনাই হয় না। লোকটার গলায় যেন দেবী সরস্বতী বিরাজ করছেন। সংগীত সম্বন্ধে জ্ঞানও বাসুদেবের অপরিসীম। বাসুদেবের কাছেই ভানুমতী নাড়া বেঁধেছিলেন। এর আগে অনেকের কাছেই গান শিখেছিলেম অবশ্য তবে নাড়া বেঁধে শিক্ষা আরম্ভ করে-ছিলেন বাসুদেবের কাছেই।

রাজনারায়ণ কাশী থেকে ধরে এনেছিলেন বাসুদেবকে। সৌম্যদর্শন তরুণ গায়ক বাসুদেবের কণ্ঠ সংগীত তাঁকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল।

রাজনারায়ণের সঙ্গে বাসুদেবের পরিচয় হয়েছিল সেবার নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে। বাসুদেবকে দেখে এবং তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হযে গিয়েছিলেন তিনি। আরো মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর গুণাগুণের ব্যাখ্যা শুনে। তিনি শোনেন: কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সম্মান নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে পর পর তিনবার তিনি উচ্চাঙ্গ সংগীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন বর্তমানে তিনি ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে গবেষণা করছেন। আর্থিক অবস্থা বাসুদেবের বিশেষ ভালো নয়। কলকাতায় ভবানীপুর অঞ্চলে ছোট একখানি পৈতৃক বাড়ি আছে। আর সামান্য কিছু পৈতৃক সঞ্চয় আছে। সংসারে বাসুদেব নিতান্তই একা। বাপ-মা, ভাই-বোন কেউ নেই। থাকার মধ্যে আছে তাঁর লেখাপড়া আর গান বাজনা।

উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলেন জমিদার রাজনারায়ণ। তাঁর মনের কোণে কী যেন একটা গোপন আশা উঁকি দিয়েছিল।

তিনি নিজে গিয়ে আলাপ করেছিলেন বাসুদেবের সঙ্গে সেই সম্মেলনের মধ্যেই।—তোমাকে আর আপনি বলবো না। তুমি আমার ছেলের বয়সী। প্রথমটা চমকে উঠেছিলেন যেন বাসুদেব। তারপর

সহাস্যে বললেন—না না। কিছুতেই নয়। তাতে আমার অপরাধ বাড়বে। আমায় আপনি তুমিই বলুন।

—তাই বলছি বাবা! তবে কিনা আজকালকার ছেলে-ছোকরারা হঠাৎ তুমি বললে চটে যায়।

—তা যে যায় যাক্‌, আমি যাব না।

—বড় খুশি হলাম বাবা! বড় খুশি হলাম। তোমার গান আমার বড়ই ভাল লেগেছে।

—আশীর্বাদ করুন, যেন আপনাদের আনন্দ দিতে পারি।

বাসুদেব নমস্কার করেন জমিদার রাজানারায়ণকে।

রাজানারায়ণ তাড়াতাড়ি তাঁর মাথায় একটি হাত রাখেন।

—গান যে আমি কত ভালোবাসি সে আর তোমায় বলে বোঝাতে পারবো না বাবা। এই গানের জন্যে কত পয়সা যে ব্যয় করেছি তার কোন হিসেব নেই। কিন্তু তোমাকে যে একবার আমার বাড়িতে যেতে হবে বাবা। যেতেই হবে। না গেলে আমি কিছুতেই ছাড়বো না। সত্যিই ছাড়েননি তিনি। বাসুদেবের কোনো আপত্তি শোনেননি। সেবার সংগীত সম্মেলন থেকে ফেরবার সময় বাসুদেবকে সঙ্গে নিয়ে কালীগড়ে আসেন।

বাসুদেবের খুবই ভালো লেগেছিল রাজনারায়ণের ব্যবহারটা। আরো ভালো লেগেছিল কালীগড় গ্রামখানি।

ভানুমতীর সঙ্গে বাসুদেবের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন রাজনারায়ণ।

আমার মেয়ে। এই আমার একমাত্র সন্তান। আই, এ, পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিলে। লেখাপড়া ওর ভালো লাগে না। বলে, মাথায় ঢোকে না। গান বাজনার ভয়ংকর ঝোঁক। গান শিখছেও। গায়ও মন্দ না।

একটু থেমে বলেছিলেন: তবে মুশকিল হয়েছে—সে রকম ওস্তাদ পাওয়া যাচ্ছে না। ইতিমধ্যেই তো প্রায় চার পাঁচজন ওস্তাদ এলেন।

মোটা মোটা মাইনেও দিয়েছি কিন্তু কই, সে রকম প্রোগ্রেস তো হ'ল না। ওর ও কারুর শিক্ষা তেমন মনঃপুত হচ্ছে না।

ভানুমতী লজ্জায় অধোবদন হয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছিলেন। তাঁর বুকের ভেতর যেন একটা ঝড় বইছিল। অস্বাভাবিক ঝড়।

মাঝে মাঝে কুণ্ঠিত লজ্জায় গোপন দৃষ্টিপাত করছিলেন তিনি প্রশান্ত হাস্য মুখ মণ্ডিত বাসুদেবের দিকে।

মানুষ এত সুন্দর হয়!

রাজনারায়ণ বলে যাচ্ছিলেন: আমার বড় ইচ্ছে বাবা, তুমি যদি ওকে একটু তালিম দাও। তুমি যত টাকা পারিশ্রমিক চাও আমি—

বাধা দিয়েছিলেন বাসুদেব।

—কিন্তু পরিশ্রমিক নিয়ে তো আমি গান শেখাই না। আমার গুরুর নিষেধ।

—তবে?

—শেখাতে হলে আমি বিনা পারিশ্রমিকেই শেখাবো।

—শেখাতে হলে নয় বাবা, শেখাতেই হবে। আমার একান্ত সাধ।

হেসেছিলেন বাসুদেব। হেসে বলেছিলেন—আমার কতকগুলি শর্ত আছে। এই শর্ত যে না মানে আমি তাকে গান শেখাই না।

—বলো, বলো বাবা! তোমার শর্ত কী?

একটু থেমে বাসুদেব বলেছিলেন—আমার কাছে গান শিখতে হলে প্রথমে নাড়া বাঁধতে হবে। অর্থাৎ আমায় গুরুত্বে বরণ করতে হবে। আমার বিনা অনুমতিতে কোনো গানের আসরে, কোনো জলসায় গান করতে পারবে না। আমি যতদিন না বলবো ততদিন কাউকে গান শেখাতে পারবে না। সংগীতকে জীবনের সাধনা করে নিতে হবে। আর, আর—

বাসুদেব একবার রাজনারায়ণের মুখের দিকে, একবার ভানুমতীর লজ্জা রাঙা অবনত মুখের দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্ততঃ করে বলেছিলেন:

আর শিক্ষা আরম্ভের পর অন্ততঃ পাঁচ বছর কাল কঠিন সংযম পালন করতে হবে। এর মধ্যে বিবাহ চলবে না।

—তাই হবে।

রাজানারায়ণ বলেছিলেন—তাই হবে। এই তো মাত্র আঠারো বছর বয়স ওর। পাঁচ বছর বিয়ে না দিলে কোনো ক্ষতি হবে না।

—কিন্তু সমস্ত শর্ত পালন করা কি ওঁর পক্ষে সম্ভব হবে?

—হবে, হবে। কি রে ভানু, পারবি না?

—পারবো।

কাঁপা গলায় উত্তর দিয়েছিলেন ভানুমতী।

তারপর আর বিশেষ দেরী হয়নি। একটা শুভদিন দেখে বাসুদেব শিক্ষা দান শুরু করেন ভানুমতীকে।

কিন্তু সে আজ বহুদিনের কথা। তারপর সংসারে কত কি ঘটে গেল। কত সম্ভব অসম্ভব ঘটনা। ভাবছিলেন ভানুমতী। ভাবছিলেন ছাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সবই মনে আছে ভানুমতীর। মনে আছে ফেলে আসা জীবনের ছোট বড় সমস্ত ঘটনা। আবার একটা উদ্দাম বাতাস দুরন্তবেগে বয়ে গেল।

আকাশ মেঘে মেঘে অন্ধকার হয়ে গেছে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বড় বড় ফোঁটা। একটা ফোঁটা ভানুমতীর নাকের ওপর পড়লো। পড়ে রেণু রেণু হয়ে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো। ধুলোয় মাথার চুলগুলো বিবর্ণ হয়ে গেছে। কতকগুলো শুকনো পাতার টুকরো রাস্তা থেকে উড়ে এসেছে। উড়ে এসে ভানুমতীর কাপড়ে আটকে গেছে।

বাতাসের বেগ বাড়ছে। সেই সঙ্গে বৃষ্টিরও।

আর এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। ভানুমতী সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। থু থু। মুখের মধ্যে ধুলো ঢুকে গেছে। দাঁত দিয়ে জিভটা পরিষ্কার করে থুথু ফেললেন। কাপড়টা গায়ে ঠিক করে জড়িয়ে নিতে

গেলেন। গিয়ে দেখলেন গায়ের আঁচলটা কখন খসে গেছে। আর সেই আঁচল হাওয়ায় পত্ পত্ করে উড়ছে। অকারণেই কেমন হাসি পেল ভানুমতীর।

কিন্তু আদিত্য এখনো আসছে না কেন? কলকাতা থেকে আসতে কত সময় লাগে?

নাঃ! ছেলেটা ভাবালে দেখছি। এই ঝড়ে জলে এখন আসবে কি করে? অত বড় ছেলে হল—এতটুকু বুদ্ধি যদি থাকে।

ভানুমতী বেশ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। মুখে চিন্তার রেখা পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

আর একবার তিনি স্টেশনের পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে গেলেন। পারলেন না। ওদিকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সব ঘোলা। মাঠের ওপর বৃষ্টি নেমেছে। সেই সঙ্গে ঝড়। বৃষ্টিটা মাঠের ওপর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে এই দিকে।

আর ছাদে থাকা সমীচীন নয়। ভানুমতী ত্রস্ত পায়ে ছাদ থেকে নীচে নেমে গেলেন

মস্ত বড় চক্‌মিলানো বাড়ি। রাজনারায়ণের বাড়ি। ভেতরে বাইরে চতুর্দিকে চওড়া দালান। মধ্যভাগে সারি সারি ঘর। রীতি মত বড় বড় ঘর। যেমন নীচে, তেমনি ওপরে।

বাড়ির সামনে খানিকটা খোলা মাঠ।

পেছনে বিস্তৃত ফুল বাগান। এবং কয়েকটি মনোরম ছোট বাড়ি সেই বাগানের এক প্রান্তে। বাগানবাড়ি নামে খ্যাত।

কিন্তু সে কথা যাক!

এত বড় বাড়ি। এত ঘর দালান। এর অধিকাংশ ফাঁকাই পড়ে আছে—থাকার লোক নেই। একদিন অবশ্য ছিল, আজ নেই।

আজ এ বাড়িতে থাকবার মধ্যে আছেন ভানুমতী। তাঁর ছেলে আদিত্য আর দু'চারজন আত্মীয় পরিজন। যাদের আর কোথাও মাথা গোঁজার আশ্রয় নেই। এ ছাড়া আছে—দাসী চাকর, দরোয়ান। জনতিনেক জমিদারি দেখাশোনার সাবেকী কর্মচারী।

বাগান বাড়িটা এমনি পড়ে আছে। বছর দশ বারোর মধ্যে কেউ সেদিকে গেছে বলে মনে হয় না। বাগানটাও শ্রীহীন হয়ে গেছে। মালী নেই অনেককাল। আগাছার জঙ্গলে চারদিক ভরে গেছে। বাগানের মাঝখানে ঘেরা পুকুরটা আজও তেমনি আছে। শ্বেতপাথরের বাঁধানো ঘাটের সিঁড়িগুলো দিন দিন বরং আরো যেন সাদা হচ্ছে মসৃণ হচ্ছে।

ভানুমতী চারিদিকে ঘুরে বেড়ান। আর অতীত স্মৃতি রোমন্থন করেন। নিত্য দুটি বেলা তিনি এসে এই ঘাটে অনেকক্ষণ বসে থাকেন। বেশ লাগে তাঁর এইখানে চুপটি করে বসে থাকতে।

মাঝে মাঝে ভারি ফাঁকা মনে হয় বাড়িটাকে। মনে হয় এ যেন সে বাড়ি নয়। বাবার মৃত্যুর পর সে বাড়িরও মৃত্যু ঘটেছে।

কখনো কখনো আবার তিনি আদিত্যকে কেন্দ্র করে স্বপ্ন রচনা করেন। আদিত্যের বিয়ে দেবেন। একটি টুকটুকে বউ নিয়ে আসবেন। আবার সংসার জাঁকিয়ে তুলবেন।

স্বপ্নের ভেলা ভাসিয়ে ভানুমতী বহু দূরে চলে যান।

এমনি করেই ভানুমতীর জীবনের দিনগুলো একে একে কেটে যায়। ভানুমতী এখন আর বালিকা নয়। যুবতীও নয়। প্রৌঢ়া। হ্যাঁ, প্রৌঢ়াই বলা চলে তাকে। তার আয়ু থেকে পঁয়তাল্লিশটা বছর ঝরে গেছে। পঁয়তাল্লিশটা বসন্ত তার জীবন মালঞ্চে পা ফেলে ফেলে চলে গেছে শুধু কি চলেই গেছে? রেখে যায় নি কিছু? গেছে। স্মৃতির সঞ্চয় রেখে গেছে। অনুতাপের অগ্নিজ্বালা রেখে গেছে। যে জ্বালা সদা সর্বদা

তাকে দগ্ধ করছে। সদা সর্বদা একটা ভীতি, একটা শংকিত সংশয় তার মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে।

তার জীবনের ইতিহাস কেউ কি জানে? জানে না। সে ইতিহাস বড় লজ্জার। বড় কলঙ্কের। বড় বেদনার।

সময় সময় সন্দেহ হয়—বুঝি বাবা জানতে পেরেছিলেন। বুঝি জানতে পেরেই তিনি নির্জন শয্যায় নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। তারপর মৃত্যুর কোলে মুখ লুকিয়ে ফেললেন। বোধ করি তাঁর স্বামীও তাকেও সন্দেহ করেছিলেন। তাই—

কিন্তু আদিত্য? তার ছেলে আদিত্য?

না না! আদিত্য কিছু জানে না। আদিত্যকে কোনো মতেই জানতে দেওয়া হবে না। তার আগেই ভানুমতীর যেন মৃত্যু হয়।

লোকে বলে ভানুমতীর মতো মেয়ে হয় না। রূপে লক্ষ্মী—গুণে সরস্বতী। সতীলক্ষ্মী মেয়ে। ওর সিঁথের সিঁদুর যে কেন মুছলো—

কেন মুছলো সে কথা ভানুমতী জানেন। জানেন তিনি কেমন সতীলক্ষ্মী!

রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী!

শুনে ভারি হাসি পায় ভানুমতীর।

গুণ যে তার কত সে তিনি ভালোই জানেন। আর রূপ? হ্যাঁ, এই রূপই তাঁর সর্বনাশ করছে। পোড়া রূপ আজও তাকে মুক্তি দেয় নি। বাস্তবিক জীবনখানা তার নষ্ট হয়ে গেছে। কামনার ঊর্মি দোলায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন তিনি তার যৌবনের ভেলাখানি। কোনদিকে তাকাননি। তাকাবার অবসর পাননি।

কিন্তু কেন তার জীবনখানা এমন উচ্ছৃঙ্খল হল? সব জেনে, সব বুঝে কেন তিনি অমন পিচ্ছিল পথে পা দিয়েছিলেন? তার অধঃপতনের জন্যে কাউকে তো তিনি দায়ী করতে পারেন না। তিনি নিজেই এগিয়ে গিয়েছিলেন।

মনে আছে সবই ভানুমতীর। মনে আছে সেই প্রথম বুকের মধ্যে কামনার বাত্যা প্রবাহের কথা। যেদিন বাসুদেবকে সামনে দেখলেন সেদিনের কথা কোনদিন ভুলতে পারবেন না তিনি। বাসুদেবই তার স্থির নিস্তরঙ্গ কামনা সমুদ্রে প্রথম আলোড়ন তোলেন। কিন্তু বাসুদেবই কি প্রথম।

মৃদু হাসির সঙ্গে একটা নিঃশ্বাস মোচন করলেন তিনি।

মনে আছে। সবই মনে আছে। কিছুই ভোলেন নি তিনি। ভুলতে পারেন নি। ভোলা সম্ভবও নয়।

আজো ওই বাগান বাড়িটার দিকে তাকালে তার বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে। মনের আয়নায় ভেসে ওঠে সেই অপূর্ব সুন্দর মানুষটার মুখখানা। মনের কোণে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে সেই আশ্চর্য মাধুর্যভরা কণ্ঠের সুরালাপ।

কোনে করাতি তোরিই বীণাতি পিয়াবোরা—

সত্যি মানুষটাকে চেষ্টা করেও ভোলা যায় না।

অন্ততঃ ভানুমতীর পক্ষে ভোলা সম্ভব নয়।

বাসুদেবকে ভালোবেসেছিলেন ভানুমতী। প্রথম দেখেই ভালোবেসেছিলেন। রাজনারায়ণ বলেছিলেন—ভানু, বড় গুণী ছেলে রে। অনেক বলে করে এখানে ধরে আনতে পেরেছি। তোর বহু ভাগ্য যে ও তোকে গান শেখাতে রাজী হয়েছে। নইলে শুনেছি, ও কাউকে শেখাতে চায় না।

ভানুমতী জিজ্ঞাসা করেছিলেন—খুব অহংকারী বুঝি?

—আরে না, তা নয়। খেয়ালী ভয়ংকর। তা ছাড়া মেয়েদের একটু থেমে বলেছিলেন—ও যে শর্তগুলো পালন করতে বলেছে—ভুলিস নি যেন। তাহলে কিন্তু ওকে দিয়ে কোনো কাজ পাবি না।

হোসছিলেন ভানুমতী। মনে মনে হেসেছিলেন। বোধ করি ভেবেছিলেন লোকটাকে ভালোবাসার জালে আটকে ফেলবেন।

রাজনারায়ণও মনে মনে ভেবেছিলেন আটকে ফেলবেন বাসুদেবকে, আটকে ফেলবেন অর্থে আর স্নেহে। তারপর—তারপর একদিন বাসুদেবের হাতে তুলে দেবেন তার সমুদয় বিষয় আশয়। তুলে দেবেন ভানুমতীকে। কিন্তু সে এখুনি নয়। তার জন্যে প্রস্তুতির প্রয়োজন। সেই প্রস্তুতি ধীরে ধীরে চললো তাঁর '

আর চললো সেই সঙ্গে ভানুমতীর ভালোবাসার জাল বোনা।

একই লক্ষ্যে পিতা পুত্রী এগিয়ে চললেন, কিন্তু কেউ কাউকে মনের কথা জানতে দিলেন না।

কালীগড় গ্রামখানিকে বড় ভালো লাগলো বাসুদেবের। আরো ভালো লাগলো জমিদার রাজনারায়ণবাবুর বাগান বাড়িটা। চমৎকার নিরিবিলি জায়গা। চারিদিকে ফুলের বাগান।

বাগানের মধ্যে একটু উত্তরে এগিয়ে গেলেই বিশাল দীঘি। দীঘির চারপাশে বাহারী গাছের প্রাচীর দীঘিটাকে বাইরের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছে। দীঘির ঘাটটিও মনোরম।

জলের মধ্যে অসংখ্য পদ্মের বাহার। বাগানের পরেই প্রাকৃতিক শোভা। বেশ জায়গা। সাধনা করার যোগ্য স্থান।

শহর ভালো লাগে না বাসুদেবের। বেশি লোকজনও সহ্য হয় না। সাধনার ব্যাঘাত হয়। জীবনটাকে সুরের সাধনায় উৎসর্গ করে দিয়েছেন বসুদেব। জীবনে সুর ছাড়া আর কিছুই যেন জানেন না। সুরে সুরে মাতাল হয়ে আছে তার সর্ব চিত্ত। সেখানে আর অন্য কোনো চিন্তা নেই অন্য কোনো ভাবনা নেই। কেবল গান আর গান।

ভালো লাগলো তাঁর এই জায়গা। ভানুমতীকে গান শেখাতে রাজী হলেন কেবল এই জায়গায় থাকতে পারার লোভে।

এত ভালো লাগলো কেন এই জায়গা? এ প্রশ্নের উত্তর নিজের মনের মধ্যে কোথাও খুঁজে পাননি বাসুদেব। তবু ভালো লেগেছিল।

ভানুমতীকে গান শেখাতে আরম্ভ করলেন বাসুদেব।

বাঃ। মেয়েটার গলা আছে—শিখতে পারবে।

সেবার কিছুদিন কালীগড়ে থেকে আবার কলকাতায় চলে গেলেন বাসুদেব। কোন বাঁধা ধরা নিয়মের মধ্যে থেকে—সময় দেখে গান শেখাতে পারবেন না তিনি গোড়াতেই বলে দিয়েছিলেন। বলে দিয়েছিলেন: আমার যখন সুবিধা হবে এবং ইচ্ছা হবে তখুনি এসে আমি ভানুমতীকে শিখিয়ে যাবো তাতেই রাজী হয়েছিলেন রাজানারায়ণ। অস্তে আস্তে বাঁধন শক্ত করার পক্ষপাতী তিনি। তাড়াতাড়ি করে কিছু করতে রাজী নন।

কিন্তু ব্যাপারটা ভানুমতীর মনঃপুত হয়নি। তা নাই হোক। তিনি কোনো আপত্তি তোলেননি।

প্রথমবার এসে বাসুদেব প্রায় মাস দুই এখানে থাকেন। তারপর চলে যান। অবার মাসখানেক পরে আসেন দিন কতকের জন্যে। আবার চলে যান। আবার আসেন। আবার যান।

এমনি করে বছরখানেক কাটাবার পর একদিন তিনি কথায় কথায় রাজনারায়ণকে জানালেন: ভানুমতীর বেশ উন্নতি হচ্ছে।

রাজনারায়ণ বললেন—যা হচ্ছে সে তোমারই জন্যে বাবা। তুমি যদি আরো একটু ওর প্রতি মনোযোগ দিতে পারতে তা'হলে ও আরো উন্নতি করতো বলে মনে হয়।

—তা অবশ্য করতো।

বাসুদেব বললেন—কিন্তু আমার আসা যাওয়ার বেশ অসুবিধা হয় কি না। অনেকটা দূর তো।

—তা তো বটেই। তোমার তো বাবা কলকাতায় না থাকলে চলবে না। নইলে এখানে—

—এখানে ? তা মন্দ হয় না। কলকাতায় আমার থাকতেও ভালো লাগে না। আকর্ষণ তো আমার কিছু নেই। আকর্ষণ শুধু গানের।

—তোমার আত্মীয়স্বজন ?

—নাঃ। আমার আত্মীয় স্বজন তেমন কেউ নেই। ছোটবেলায় বাবা-মা মারা গেছেন। অতি দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়ি মানুষ হয়েছি। তা তারাও আর আমাকে তেমন চান না। আমিও যাওয়া আসা করি না। মাঝে মাঝে তাঁদের অভাব অভিযোগে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করি, এই মাত্র সম্পর্ক।

একটু থেমে বাসুদেব বলেন—বাবা কিছু সঞ্চিত টাকা রেখে গেছেন। আর রেখে গেছেন ভবানীপুরে একখানা ছোট বাড়ি।

রাজনারায়ণ জিজ্ঞাসা করেন—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো বাবা ?

—নিশ্চয় করবেন।

—তোমার এই গানের দিকে এমন—

—ঝোঁক এলো কি করে ?

—হ্যাঁ—বাসুদেব একটু হাসলেন।

এমন সময় আস্তে আস্তে ভানুমতী সেখানে এসে দাঁড়ালেন।

রাজনারায়ণ সহাস্যে তার দিকে চেয়ে বললেন—আয়! বস।

ভানুমতী এক পাশে বসলেন। একবার বাসুদেবের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি নত করে নিলেন।

রাজনারায়ণ বললেন—ভানু! বাসু বলেছেন ওর কলকাতা থেকে এখানে আসা যাওয়া করতে কষ্ট হয়।

আর একবার দৃষ্টিপাত করলেন ভানুমতী। দৃষ্টিপাত করলেন বাসুদেবের মুখের দিকে। তারপর বাবার দিকে তাকালেন।

রাজনারায়ণ বললেন—তা আমি বলি কি, কী দরকার এত কষ্ট করার। এখানে তো আমাদের ঘর দোর সব পড়েই রয়েছে। ইচ্ছে হলেই তো উনি থাকতে পারেন

—বেশ তো থাকুন না।

ভানুমতীর ঠোঁটের কোণে কেমন হাসি ফুটে উঠলো। বললেন—তাহলে আমার ভারি মজা হয় কিন্তু।

—কেন? বাসুদেব প্রশ্ন করলেন।

এমন প্রশ্ন উঠবে চট করে ভাবতে পারেন নি ভানুমতী—তিনি কেমন একটু বিমূঢ় হয়ে গেলেন। ফর্সা মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল। তিনি অধোবদনে আঙুলে আঁচলের প্রান্ত জড়াতে লাগলেন। কপাল ঘেমে উঠলো তার।

বাসুদেব স্থির চোখে ভানুমতীর দিকে তাকিয়েছিলেন। আবার প্রশ্ন করলেন—কেন? আমি থাকলে তোমার কি মজা হয়?

ভানুমতী এবার গলগল করে ঘামতে লাগলেন। মুখটা আরো রক্তাভ হয়ে উঠলো। রাজনারায়ণ বললেন—কি রে? বল। চুপ করে রইলি কেন?

তবুও কোনো কথা বলতে পারলেন না ভানুমতী মাথা নীচু করে জড়সড় হয়ে বসে রইলেন

বাসুদেব তেমনি তার দিকে তাকিয়ে আছেন: তাকিয়ে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। ভানুমতীর এই লজ্জাটা বড়ো ভাল লাগে তাঁর। কেন ভালো লাগে তা তিনি জানেন না।

রাজনারায়ণও হাসছেন বাসুদেবের হাসি দেখে।

—কী রে? বল।

—কী বলবো?

ভানুমতী একটু ঝঙ্কারের সুরে বললেন।

রাজনারায়ণ বললেন—তোর লজ্জাটা আর গেল না। বাসু তোর

গুরু। তাছাড়া বাসু ঘরের ছেলের মতো ওর কাছে অত লজ্জা কিসের ?

—লজ্জা করলুম আবার কোথায় ? উনি থাকলে সব সময় ওর গান শুনতে পাবো। শিখতে পারবো। সেই মজা, আর কি মজা।

—তাই বলো।

বাসুদেব বললেন—কিন্তু আমি এখানে থাকলে ওই বাগান বাড়িতে থাকবো।

—বেশ তো। তোমার যেখানে খুশি থাকবে।

রাজনারায়ণ বললেন—ভানু, তুমি আজই লোক লাগিয়ে বাগান বাড়িটা সাফ্ করিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে দেবে। সরকার মশাইকে এখুনি বলে দাও ব্যবস্থা করতে।

বলেই বাসুদেবের দিকে তাকালেন।

—হ্যাঁ যা, আমাদের যে কথা হচ্ছিল।

-কথা ?

মনে মনে কি একটা সুর ভাঁজছিলেন বাসুদেব। চমকে উঠলেন রাজনারায়ণের কথায়। আবিষ্ট চোখ তুলে তাকালেন রাজনারায়ণের দিকে। রাজনারায়ণ বললেন—ওই যে তোমার গান শেখার কথা। মানে—

—ও হো। শেখা নয়। আমার ঝোঁক এলো কোথা থেকে। তাই না ?

—হ্যাঁ।

বাসুদেব বলতে লাগলেন। থেমে থেমে বলতে লাগলেন।

—গান আমি অতি শিশুকাল থেকে শুনেছি, ভালোবাসতুম। আমার মা বলতেন শুনেছি যে, আমি নাকি আমার ঠাকুরদাদা মরে আবার জন্মেছি। আমার ঠাকুরদাদা মস্ত গুণী মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন সংগীত বিশারদ। আমাদের আদি বাড়ি ছিল বিষ্ণুপুর।

বিষ্ণুপুর গানের জন্মে বিখ্যাত। ওদিকের লক্ষৌ যেমন, বাংলাদেশে বিষ্ণুপুর তেমন। আমার ঠাকুরদার বহু শিষ্য ছিল। এখনো অনেক শিষ্য জীবিত আছেন।

বাসুদেব বলে যেতে লাগলেন।

—আমার বাবাও ভালো গান করতে পারতেন। তবে তিনি চর্চা করতেন না। আমাদের বংশের সবাই অল্পবিস্তর গান জানতেন। সেই ধারাই হয়তো আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে থাকবে।

—ছেলেবেলা থেকেই বুঝি গান ভালোবাসো তুমি ?

—হাঁ। গান ছাড়া আমি থাকতে পারতুম না। মায়ের মুখে শুনেছি—আমি নাকি এতটুকু থেকেই গানপাগল। আমাকে খাওয়াতে গান লাগতো। ঘুম পাড়াতে গান লাগতো। আমার অস্থিরতা মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেত গান শোনালে। তারপর একটু বড় হতে নিজে নিজে সুর ভাঁজতে আরম্ভ করি। যাত্রা থিয়েটার সিনেমা—যেখানে গান হবে খবর পেতুম, যেমন করে হোক, সেখানে আমি যাবই। এজন্মে অনেক শাসনও আমায় হজম করতে হয়েছে। তবে আমার মায়ের সাধ ছিল যে আমাকে গাইয়ে করে তোলার। আমার মা বড় গান ভালোবাসতেন।

মায়ের কথা বলতে বলতে বাসুদেব কেমন উদাস হয়ে গেলেন।

রাজনারায়ণ বললেন—মায়ের কথা তোমার মনে আছে ?

—কেন থাকবে না! আমি ম্যাট্রিক পাস করার পর মা মারা গেছেন। অবশ্য বাবা গেছেন তার অনেক আগে।

একটু থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করলেন বাসুদেব। তারপর ভানুমতীর দিকে তাকিয়ে বললেন—আমার মায়ের মুখটা অনেকটা এঁর মতো ছিলো।

—তাই নাকি !

রাজনারায়ণ সঙ্গে সঙ্গে কন্যা ভানুমতীর মুখের দিকে তাকালেন।

যাই হোক! শেষ পর্যন্ত স্থির হল, বাসুদেব কিছুদিন এই কালীগড়ে থাকবেন। থেকে সাধনা করবেন। সংগীত সাধনা আর সেই সঙ্গে ভানুমতীকে সাধনার অংশ দান করবেন।

থাকবেন ওই বাগান বাড়িতে। একা থাকবেন। কেবল ভানুমতীর স্বাধীনতা থাকবে। তিনি ইচ্ছা মতো ওখানে যেতে পারবেন। আর যেতে পারবে ঘর দুয়োর পরিষ্কার করার জন্যে বাড়ির বুড়ো চাকর রঘু সকাল সন্ধ্যায়। এছাড়া বাসুদেবের বিনা অনুমতীতে ওখানে আর কেউ যেতে পারবে না। এমন কি রাজনারায়ণও নয়। বাসুদেবের সেবার দায়িত্ব ভানুমতীর। স্বেচ্ছায় ভানুমতী এ ভার গ্রহণ করলেন।

সেবার প্রায় এক বছর একটানা কালীগড়ে ছিলেন বাসুদেব।

বাগান বাড়িটা জমজমাট হয়ে উঠেছিল—বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর ঝঙ্কারে। রাজনারায়ণ বলেন—আমার বাগানবাড়ি আবার সাবেকী দিনে ফিরে গেছে। রাজনারায়ণের আত্মতৃপ্তির যেন শেষ নেই।

জাল বুনতে আরম্ভ করলেন তিনি। স্বপ্নের জাল। বাসুদেব আর ভানুমতীকে নিয়ে। কিন্তু মনের কথা তিনি প্রকাশ পেতে দিলেন না। তাঁর ধারণা ওরা নিজেরাই পরস্পরের দিকে এগিয়ে যাবে। সুযোগ সুবিধা কিছুরই তো অভাব নেই। কোন বাধাও নেই।

ভাবেন জমিদার রাজনারায়ণ। ভাবেন, ধীর পদবিক্ষেপে সেই শুভদিন এগিয়ে আসছে। যেদিন সে শুভদিনের আবির্ভাব হবে সেদিনটা তার জীবনের কত আনন্দের! কত তৃপ্তির।

রাগ ভৈরবের সঙ্গে রাগিনী ভৈরবের মিলন। সে একটা আশ্চর্য মিলন। ভাবতে ভাবতে আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন রাজনারায়ণ। মাঝে মাঝে তিনি ভানুমতীর মুখের দিকে লক্ষ্য করেন। সে মুখের ভাব

অনুমান করার চেষ্টা করেন। কণ্ঠস্বরে ভানুমতীর বৈচিত্র্য এসেছে। এখন সে অনেক—অনেক ভালো গান করে। প্রেমের গান তার গলায় যেন মূর্ত হয়ে ওঠে।

সুরে দরদের দানা।

ভানুমতী যখন গান করেন—তুম সে ক্যাইসে পিত করেঙ্গে হাম....'

অবাক হয়ে শুনেন রাজনারায়ণ।

বাসুদেব মানুষটাকে কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারেন না তিনি। কী যে ওর প্রকৃতি! দিনরাত কেবল যেন সুরের রাজ্যে বাস করছেন তিনি। কথা বলেন কম। লোকজন বেশি পছন্দ করেন না। একা থাকতেই যেন ভালোবাসেন

তার সম্বন্ধে ভানুমতীকে প্রশ্ন করেও কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না ভানুমতীও যেন তাকে বুঝতে পারে নি আজো।

এমনি করেই দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল। এই এক বছরের মধ্যে মাত্র বার তিনেক বাসুদেব কলকাতায় গিয়েছেন। তাও নিতান্ত প্রয়োজনে। এই নির্জন নিভৃত স্থানটি ভারি ভালো লাগে তার। সাধনার যোগ্য স্থান।

বাসুদেব অত্যন্ত ঈশ্বর বিশ্বাসী। তার ধারণা—ভগবানকে লাভ করার সহজ পন্থা সংগীত। সংগীতই ভগবানের রূপ। এক একটি রাগ এবং এক একটি রাগিনী ভগবান আর ভগবতীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। সুতরাং রাগ রাগিনী বিশুদ্ধ না হলে দেবতার অঙ্গে খুঁত হবে। পূজারীর অপরাধ হবে। দেব-দেবী ক্ষুণ্ণ হবেন।

ভানুমতীকে একথা বুঝিয়েছেন তিনি। বলেছেন—ভানুমতী! গান শুনিয়ে মানুষের মন জয় করার চাইতে দেবতার মন জয়ের চেষ্টা করো। গান তো সাধারণ জিনিষ নয় ভানুমতী, ভগবান সাধনার সর্বোৎকৃষ্ট পথ। শোনোনি রামপ্রসাদের কথা? শোনোনি হরিদাস গোস্বামীর কথা?

শোনোনি মীরার কথা ? এরা সকলেই গান গেয়ে ভগবান লাভ করেছিলেন। সুরই হচ্ছে ব্রহ্ম। সেই সুরে পাগল হয়ে যেতে না পারলে গান শেখার সার্থকতা কোথায় ?

ভানুমতী হেসেছেন। হেসে বলেছেন—কই আপনি তো পাগল হননি ?

—আমি !

বাসুদেব যেন চমকে উঠলেন। তারপর আকাশে শূন্য দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে ভাঙা গলায় বললেন—আমি পাগল হতে পারিনি ভানুমতী। আমি এখনো সাধনার সে স্তরে পৌঁছুতে পারিনি। অথচ ভানুমতী আমি দিনরাত চেষ্টা করছি—

—কি চেষ্টা ? পাগল হতে ?

—হ্যাঁ—

খিল খিল করে হেসে উঠলেন ভানুমতী।

—মানুষ আবার চেষ্টা করে পাগল হতে পারে নাকি ?

আজকাল ভানুমতীর অনেক সাহস হয়েছে। বাসুদেবের সঙ্গে হাসি গল্প মধ্যে মধ্যে করেন। ভানুমতী গান শেখা এবং সেবা করার সুযোগে বাসুদেবের খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। এখন প্রায় দিনের বেশি সময় ভানুমতী বাগান-বাড়িতে বাসুদেবের আশেপাশে থাকেন।

শুধু থাকেন না—মনে মনে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন।

ভানুমতীকে খারাপ লাগে না বাসুদেবের। ভানুমতীর সেবা ভালোই লাগে। তাঁকে এতটুকু অসুবিধা পোয়াতে দেন না ভানুমতী। নিজের হাতে তাঁর আহার্য অন্দরমহল থেকে বহন করে আনেন। পাশে বসে যত্ন করে খাওয়ান। ইতিমধ্যেই জেনে নিয়েছেন কোন্ কোন্ খাদ্য তাঁর রুচিকর। বাসুদেব নিরামিষ ভোজী। তাই নানান ব্যঞ্জন নিত্য তাঁর জন্যে তৈরী করান ভানুমতী। নিজের হাতেও কিছু কিছু করেন।

এবং পাশে বসে যত্নের সঙ্গে এক এক করে সেগুলিকে খাওয়ান। এই সেবা যত্নের সঙ্গে প্রায় আজন্ম অপরিচিত বাসুদেবের বড়ই ভালো লাগে।

ভানুমতী ভালো মেয়ে। এই রকম না হলে শিষ্য! আবার কখনো কখনো হাত-পা টিপে দিতে আসে ভানুমতী। কী কাণ্ড! ভানুমতীকে ভালো করে গান শেখাবেন তিনি। নিজের শিক্ষা উজাড় করে দেবেন ভানুমতীকে।

কিন্তু বাসুদেব ভানুমতীর চিত্তলেখা পাঠ করতে পারেননি। তিনি জানেন না, বুঝতে পারেননি, কী উত্তপ্ত কামনার সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠছে ক্রমে ভানুমতীর মনের মধ্যে। তিনি লক্ষ্য করেননি ভানুমতীর আবিষ্ট চক্ষুর প্রতি। কিংবা লক্ষ্য করেও বুঝতে পারেননি। ভানুমতী কিন্তু নিজের মনকে বুঝতে পারেন। বুঝতে পারেন তিনি কী দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন ওই আত্মভোলা সংগীত সাধক বাসুদেবের দিকে। বাসুদেবের সঙ্গ ছাড়তে চায় না তার মন। বাসুদেবের সংস্পর্শে এলেই যেন কেমন হয়ে যান তিনি। যদি কোনোদিন কোনো সময় বাসুদেব তার দিকে স্থির হয়ে তাকান, তৎক্ষণাৎ তিনি আবিষ্ট হয়ে পড়েন। বাসুদেবের রক্তাভ অধরের দিকে চেয়ে তিনি নিজের অধর দংশন করেন। গান শেখাতে শেখাতে যদি বাসুদেব তার হাত থেকে কোনদিন তানপুরাটা টেনে নেন এবং সেই সময় যদি তার হাতে হাত লেগে যায়, তাহলে সর্ব-অঙ্গ তার শিরশির করে উঠে। মুহূর্তে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন তিনি। একটা দুর্বার আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে তালগোল পাকাতে থাকে। একটা দিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে ভানুমতীর। সেই চরম দিনের কথা জীবনে ভুলবেন না। ভুলবেন না আপন হটকারিতা আর কামনার দুর্বার আকর্ষণের কথা। বাসুদেবকে হারানোর দিনটি মনের পর্দায় আজো উজ্জ্বল হয়ে আছে।

কী ভুল করেছিলেন তিনি। সেদিন সারাদিন বৃষ্টি।

সন্ধ্যার কিছু আগে ভানুমতী যখন বাসুদেবের কাছে বাগানবাড়ীতে গেলেন তখন বাসুদেব গান করছেন। মেঘমল্লার সুরে আলাপ করছেন। অপূর্ব সে আলাপ। সুরালাপ। সে সুর কানে যেতেই কেমন তন্ময় হয়ে গেলেন ভানুমতী। ঘরের ভেতরে না ঢুকে তিনি বাইরের দালানে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন সেই সুরালাপ। তখুনি ভেতরে গেলে হয়তো সে সুর থেমে যাবে। তাই বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির ঝাটে ভানুমতীর পরিধেয় ভিজে গেল। হুঁস্ নেই। অনেকক্ষণ কেটে গেল। গান শুনতে শুনতে কখন তিনি গানের রাজ্য, সুরের রাজ্য ছেড়ে কামনার রাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন জানতেও পারেন নি। ওই যে ঘরের মধ্যের মানুষটি অন্তর নিংড়ে সুরের ডালা সাজাচ্ছেন, ওই মানুষটিকে নিয়েই কখন ভানুমতীর অন্তর কামনার কূপে ডুব মেরেছে। চাই—যেমন করেই হোক চাই। ওই লোকটিকে চাই। ওকে না হলে তিনি বাঁচবেন না। কিছুতেই বাঁচবেন না।

বাসুদেব বলেন—সংযম আর নিষ্ঠা। এই হল সাধনার প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ সোপান। কিন্তু কি প্রয়োজন ভানুমতীর সে সাধনায়? ভানুমতী জানেন ভালোবাসাই জীবনের ধর্ম। নরনারীর মিলনই সৃষ্টির নিয়ম। যৌবনকে কেন অবহেলা করবেন তিনি। জীবন যৌবনের আনন্দর চাইতে বড় কি আছে?

প্রেমের অপেক্ষা আনন্দ আর কিছুতে নেই। সেই প্রেমেই ডুবে যেতে চান তিনি ওই লোকটার সঙ্গে।

গান এই সময় থেমে যায় হঠাৎ। ভানুমতী অন্যমনস্ক অবস্থায় বারান্দা থেকে সরে যেতে গিয়ে ভিজে কাপড়ে পা জড়িয়ে পড়ে গেলেন। সশব্দে বেশ জোরেই পড়ে গেলেন।

—কে? কে?

ঘরের মধ্যে থেকে বাসুদেব জিজ্ঞাসা করলেন—কে? পড়ে গেল কে?

তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বাসুদেব।

—একি ভানুমতী! তুমি পড়ে গেলে? কী করে পড়লে?

তখনো সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়নি। বৃষ্টি তখন কমে গেছে। মেঘের রং সাদা হয়ে আছে। আলো যেটুকু দেখা যাচ্ছিল -কেমন ভিজে ভিজে সাদা আলো। কিন্তু অস্পষ্ট নয়।

বাসুদেব দেখলেন ভানুমতী পড়ে গেছেন। উঠতে পারছেন না আর।

কোনো চিন্তে, কোনো সংকোচ, কোন রকম ইতস্ততঃ না করেই বাসুদেব নীচু হয়ে ভানুমতীর বাহু আকর্ষণ করলেন।

—ওঠো ভানুমতী। কোথায় লেগেছে বলো?

কথা বলতে পারলেন না ভানুমতী। কথা তার হারিয়ে গেছে। বাসুদেবের স্পর্শে সর্বদেহে কাঁপন ধরে গেছে তার। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছেন। ঠোঁট দুটো শুকিয়ে উঠেছে। বুকের ভেতরটা যেন কেমন করছে। কথা বলতে পারলেন না তিনি।

—ওঠো ভানুমতী। আস্তে আস্তে ওঠো।

কিন্তু ওঠবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না ভানুমতীর। কোনো কথাও গলা দিয়ে বেরুলো না।

—কি হল ভানুমতী? উঠতে পারছ না। বড্ড লেগেছে।

ভানুমতী এবার কি একটা বলবার চেষ্টা করলেন কিন্তু স্বর বেরুলো না। কেবল মাথাটা বার দুই আন্দোলন করলেন দাঁতে শুকনো ঠোঁট কামড়ে।

বাসুদেব দ্বিধা করলেন না। ভানুমতীর দুই বাহুর মধ্যে নিজের দুটি হাত চালিয়ে দিয়ে তাকে জোর করে দাঁড় করালেন।

ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন ভানুমতী। হাঁটুতে তার একটু লেগেছে।

তবে সে লাগা মোটেই লাগা নয়। সে লাগায় উঠে দাঁড়ানো যায়—চলাও যায়। কিন্তু কামনার আবেগ তাকে স্থির নিশ্চল করে দিয়েছিল। তার ওপর বাসুদেবের স্পর্শ।

সোজা হয়ে দাঁড়াতেও যেন পারছেন না ভানুমতী। একবার বাসুদেবের মুখের দিকে বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আবার তিনি বসে পড়ছিলেন। বাসুদেব তাকে জোর করে নিবৃত্ত করলেন।

—ঘরে চলো ভানুমতী। আমায় ধরে ধরে চলো। পারবে না?

মাথা নেড়ে ভানুমতী জানালেন—না। তিনি পারবেন না।

—আচ্ছা তাহলে—

হঠাৎ বাসুদেব তাকে পাঁজাকোলো করে তুলে নিলেন।

ভানুমতী অবশ নিথর। কেবল গলা দিয়ে কেমন একটা কাঁপা স্বর নির্গত হল তার। বুঝি সমস্ত শরীরটাই বার দুই কেঁপে কেঁপে উঠলো অশেষ আবেশে।

তারপর চোখ বুজিয়ে তিনিও দুটি হাতে জড়িয়ে ধরলেন বাসুদেবের গলা। নিজের যৌবন সমুন্নত বুকের পাশে বাসুদেবের ঘন ঘন শ্বাস। আর—আর—না না। এবার পাগল হয়ে যাবেন ভানুমতী। এবার উন্মাদ হয়ে যাবেন। আর সহ্য করা যায় না।

ঝড় বইছে বুকের মধ্যে। কামনার ঝড়। উনিশ বছরের যৌবনের পীড়িত কামনার দুরন্ত ঝড়।

একবার—একবার ইচ্ছে হচ্ছে এই মুহূর্তে—

কিন্তু তার সে ইচ্ছা পূর্ণ করার আগেই বাসুদেব তাকে ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

—কি ভারি মেয়ে রে বাবা। আমি তোমায় এইটুকু বয়ে আনতেই হাঁপিয়ে পড়েছি। বাসুদেব হাসতে লাগলেন।

—কি হল তোমার? কথা বলছ না কেন ভানুমতী। তোমার বাবাকে খবর দেব কি?

চোখ মেললেন ভানুমতী। দাঁতে দাঁতে চেপে যেন নিজের চিত্তকে শাসনে আনার চেষ্টা করতে করতে অস্ফুট স্বরে বললেন—না।

—না তো কথা বলো। আস্তে আস্তে উঠতে চেষ্টা করো। কোথায় লেগেছে আমায় দেখাও, আমি একটু না হয় তেল মালিশ করে দিই।

এবার আস্তে আস্তে উঠে বসলেন ভানুমতী। বাসুদেবের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। এবার তার দৃষ্টিতে কেমন যেন আগুনের স্পর্শ। ইচ্ছে হচ্ছে—এখুনি ছুটে গিয়ে ওই নির্বোধ গান পাগলাটাকে জড়িয়ে ধরতে। জড়িয়ে ধরে ওর দেহের সঙ্গে নিজের দেহটাকে পেষিত নিষ্পেষিত করতে।

একটা নিঃশ্বাস ফেললেন ভানুমতী, তপ্ত নিঃশ্বাস।

লোকটাকে কি মদনদেবতা একেবারেই ভুলে গেছেন? ওর মাথায় একবার কী তিনি ভর করতে পারেন না।

বাসুদেব বললেন—কই কোথায় লেগেছে বললে না?

—বুকে।

—বুকে! সর্বনাশ। ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বাসুদেব।

—তাই তো। আচ্ছা, একটু তেল জল এনে দিচ্ছি মালিশ করো। আর ওই ভিজে কাপড় জামাগুলো ছাড় দিকি।

—কি পরবো?

—আমার ধুতি পরো আপাততঃ।

—আর গায়ে আপনার কামিজ পরবো?

হো হো করে হেসে উঠলেন বাসুদেব।

—তা মন্দ হয় না। তোমাকে খারাপ দেখাবে না তা বলে।

বলেই হঠাৎ গম্ভীর গেলেন। ভুরু কুঁচকে ভানুমতীর দিকে তাকিয়ে বললেন—কিন্তু আর দেরী কোরো না লক্ষ্মীটি। ভিজে কাপড় ছেড়ে

কেন। অসুখ করবে। যদি বলো তো না হয় তোমার বাড়ি থেকে কাপড় আনিয়ে দিই।

—না। আমি ধুতিই পরবো।

—পরো

—বাসুদেব কাপড এগিয়ে দিয়ে বাইরে চলে গেলেন।

ভানুমতী দাঁতে ঠোঁট কামড়ে তারপরেও কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলেন। কেন যেন কান্না পেতে লাগলো তার। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। সামনেই আয়না বসানো প্রকাণ্ড আলমারিটা। তাতে তার মূর্তি প্রতিফলিত হয়ে উঠলো তিনি দেখলেন। দেখে পায়ে পায়ে আয়নাটার কাছে এগিয়ে গেলেন। স্থির হয়ে দাঁড়ালেন গিয়ে। বুকের ওপর একটা হাত রাখলেন। কিছুক্ষণ সেইভাবে থেকে কাপড়টা খুলে ফেললেন। বুকের ব্লাউজ খুলে ফেললেন। উন্মুক্ত উন্নত বুকের দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলেন

বাইরে থেকে বাসুদেবের গলা শোনা গেল

—হয়েছে ভানুমতী?

—এই যে হল। ক্ষিপ্র হাতে কাপড় ছড়ে ফেললেন ভানুমতী। ছেড়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন।

—আসুন।

ভানুমতীর গায়ে জামা নেই। কাপড়খানা জড়ানো। বেশ ভালো করেই জড়ানো তবু কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করছে। যৌবনোন্নত দৃঢ় বক্ষ কিছুতেই আয়ত্তে থাকছে না। ভানুমতী আড়াআড়ি ভাবে দুটি হাত বুকের ওপর দিয়ে দাঁতে ঠোঁট কাঁমড়ালেন। বাসুদেব সহসা একটু এগিয়ে গিয়ে একেবারে ভানুমতীর সামনে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে বিশ্বকবির একটা কবিতা সহাস্যে আবৃত্তি করে উঠলেন—

....আনন্দময়ী মূরতি তোমার
কোন্ দেব আজি আনিল দিবা,

তোমার পরশ অমৃত সরস
তোমার নয়নে দিব্য বিভা।

ভানুমতী আরো সংকুচিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু বুকখানা যেন তার লাফিয়ে উঠলো। 'তোমার পরশ অমৃত সরস'।

তাহলে কি ভানুমতীর মতোই বাসুদেবেরও চিত্তে ঝড় বইছে। মদন ঠাকুর কি তাহলে তার মনের প্রার্থনা শুনেছে।

আবেশ বিহ্বল চোখে বাসুদেবের মুখের পানে তাকালেন ভানুমতী।

ভানুমতীর মনখানা আরো নেচে উঠলো। তার সংকোচভাব আর নেই। বাসুদেব বসলেন। তানপুরাটা তুলে নিলেন। নিয়ে অর্ধনিমীলিত চক্ষে আলাপ সুরু করলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। বৃষ্টির জোর নেই আর। টিপ টিপ করে পড়ছে।

ভানুমতী একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। দাঁতে ঠোঁট কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কী যে ভাবছেন তিনি নিজেও জানেন না। জানেন শুধু অশান্ত মন আরো অশান্ত হয়ে উঠছে। ওই মানুষটার দিকে কেবল তাকে আকর্ষণ করছে। ইচ্ছে করছে এখুনি ওই লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে।

ওর কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে।

ভানুমতীর পক্ষে আর নিজেকে সংযত রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ওর রূপ যৌবন প্রথম থেকেই ভানুমতীর মনকে মাতাল করে দিয়েছিল। ওর সান্নিধ্যের মাদকতা ভানুমতীকে ধীরে ধীরে আরো মাতাল করে তুলেছিল যেন দিনের পর দিন। তবুও নিজেকে কষ্টে সংযত করে রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু যে ঘটনাটা ঘটে গেল এরপর আর নিজেকে কিছুতেই সংযত রাখা যাবে না। ওর স্পর্শ যেন শরীরে মনে আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে। কী ভালো যে লাগলো! কেন তাকে তুলে নিয়ে আবার নামিয়ে দিলে ও!

বাসুদেব আলাপ বন্ধ করে ভানুমতীর দিকে তাকালেন।

—কি, তুমি এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন ? বসো।

বলেই আবার তানপুরায় ঝঙ্কার তুললেন।

—এটা কী আলাপ করছি বুঝতে পারো ?

—না।

হাসলেন বাসুদেব। অল্পক্ষণ গুনগুন করে বললেন—বুঝতে পারছ না ? পূরবী।

ভানুমতীর অন্যমনস্কতায় কখন তার দেহের আঁচল শিথিল হয়ে গেছে। বুকের প্রায় একাংশ উন্মুক্ত। হঠাৎ সেদিকে নজর পড়তে ত্রস্ত লজ্জায় সেই বিস্রস্ত অঞ্চল ঠিক করে দিতে গিয়েও দিলেন না। কি ভেবে হাত সরিয়ে নিলেন। আড় চোখে একবার তাকিয়ে দেখলেন বাসুদেব তাকে দেখছেন কিনা। নিরাশ হলেন। বাসুদেব চক্ষু নিমীলিত করে গান করছেন।

অকারণে কেমন অপমান বোধ করলেন ভানুমতী। ভীষণ কান্না পেতে লাগলো তার। আর মূহূর্তমাত্র সেখানে না দাঁড়িয়ে তিনি টলতে টলতে চলে গেলেন। চলে গেলেন ভেতর বাড়ির দিকে। বাসুদেবের এই উপেক্ষা তার সহ্য হ'ল না।

বাসুদেব তখনও তন্ময় হয়ে গান করছেন

বাড়ি এসেও শান্তি পেলেন ভানুমতী। নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ কাঁদলেন তিনি। অথচ কেন কাঁদছেন তা তিনিও জানেন না।

আচ্ছা, সত্যিই কি বাসুদেব তাকে উপেক্ষা করেন ?

নিশ্চয় করেন নইলে কতদিন কতভাবে তিনি তো এগিয়ে গেছেন তার যৌবন সম্ভার নিয়ে বাসুদেবের কাছে। কই কোনোদিন

তো বাসুদেব তাকে গ্রহণ করেন নি। বাসুদেবের কি বোধশক্তি নেই? বাসুদেব কি সর্ব কামনার ঊর্ধ্বে! যৌবনের পিপাসা নেই প্রাণে!

মনে পড়লো ভানুমতীর অরেক জনের কথা। চন্দননগরের রতিকান্তের কথা। রতিকান্ত তার এক পিসতুতো ভাইয়ের বন্ধু। লেখাপড়ায় নাকি খুব ভালো। কিছুদিন তাকে পড়িয়েছিল। বেশ ভালো পড়াতো। পিসতুতো দাদা, সুধাময় তার খুব সুখ্যাতি করত। বলত—বড় ভাল ছেলে।

সুধাময়ের সুপারিশেই রতিকান্ত তাকে পড়াতে এসেছিল। মাস কয়েক তাকে খুব ভালো পড়িয়েও ছিল। যার ফলে তিনি সেবার আশ্চর্য ভাবে ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে ওঠেন।

ভারি মিশুক ছেলে রতিকান্ত। ক'দিনের মধ্যেই যেন তাদের বাড়ির ছেলের মতো হয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে অবাধেই মেলামেশা করতো। কেউ বাধা দিত না। ভালো ছেলে যে রতিকান্ত।

আজ ভারি হাসি পায় ভানুমতীর। হাসি পায় সেই ভালো ছেলে রতিকান্তের কথা ভাবলে।

আস্তে আস্তে রতিকান্ত তার ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করতে লাগলো।

তখন কত বয়স ভানুমতীর! বছর পনেরো ষোলো হবে হয়তো। তাও খারাপ লাগতো না রতিকান্তকে। রতিকান্তর হাবভাব তাকে আকর্ষণ করতো। বেশ কিছুদিন এইভাবে কাটলো।

রতিকান্ত অনেক গল্প শোনাতো। অনেক রকম প্রলোভন দেখতো। কারণে অকারণে তার পিঠ চাপড়ে দিত। গাল টিপে দিতো। খারাপ লাগত না ভানুমতীর। এমনি করতে করতে হঠাৎ একদিন তাকে সবলে জড়িয়ে ধরে কপোলদেশে চুম্বন এঁকে দিলে রতিকান্ত। অসভ্য দুষ্টু রতিকান্ত।

মনে আছে ভানুমতীর, সেদিন প্রথমটায় যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কেমন অবশ, কেমন আচ্ছন্ন। কতক্ষণ এই ভাবটা ছিল মনে

নেই। কেমন যেন মাতাল মাতাল ভাব। তারপর তিনিও সর্পিণীর মতো ফণা তুলে বার বার দংশন করতে থাকেন রতিকান্তকে। যেন ক্ষেপে গিয়েছিলেন তিনি। রতিকান্তর অবস্থাও তাই। তাকে দলে পিষে দংশে একশেষ করে দিয়েছিল।

সেও ছিল এমনি এক ঝড়ের দুপুর। নিভৃত নিরালায় ছাদের কোণের ঘরে কামনার প্রথম ইতিহাস আরম্ভ। একটা অবরুদ্ধ উৎসের মুখ কে যেন খুলে দিলে। তারপর সেই জলস্রোতকে আর কোনো মতেই আয়ত্তে রাখা সম্ভব হল না।

রতিকান্তর সঙ্গে গোপন প্রেমে লিপ্ত হলো ভানুমতী। দিনের পরদিন তাদের প্রণয়লীলা সঙ্গোপনে চলতে লাগলো।

ভানুমতী ম্যাট্রিক ফেল করলেন

এই সময় হঠাৎ রতিকান্তও এবাড়িতে আসা বন্ধ করলে কেন করলে সেটা ভানুমতী ঠিক জানেন না। তবে অনুমান—কিছু সন্দেহ করে বাবাই তার আসা বন্ধ করেছেন।

আরো তিনটে বছর তারপর কেটে গেল। ভানুমতী কোনো রকমে ম্যাট্রিক পাস করে আই, এ, পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিলেন। লেখাপড়া তার ভলো লাগে নি। তিনি গান শিখবেন। ছেলেবেলা থেকেই গানের দিকে ঝোঁক তার খুব বেশি। গাইতেনও খুব ভালো। গানের জন্মে তার বেশ খ্যাতিও হয়েছিল।

রাজনারায়ণও তাকে ভালোভাবে গান শেখাতে চাইতেন। তিনি নিজেও গান পাগল কি না। পর পর কয়েকজন মাস্টারও রাখলেন। কিন্তু কিছুতেই মন উঠলো না। অবশেষে বাসুদেবকে নিয়ে এলেন।

ভানুমতীর মন বাসুদেবের মধ্যে হারিয়ে গেল।

ভাবছিলেন ভানুমতী। ভাবছিলেন বাসুদেবের কথা

গান ছাড়া লোকটা কি আর কিছু বোঝে না ? না, বুঝেও না-বোঝার ভাণ করে ? কিংবা উপেক্ষা ! তার প্রতি উপেক্ষা ?

আজকে যে ঘটনাটা ঘটলো এটা কি ওর কাছে কিছুই নয় ?

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন ভানুমতী। কি ভেবে মুখখানা তার কঠিন হয়ে উঠলো। দাঁতে দাঁত চেপে ভুরু কুঁচকে মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে থেকে, স্খলিত কাপড়খানা গায়ে জড়াতে জড়াতে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বেরিয়ে গেলেন বাগান বাড়ির উদ্দেশে। মাতালের মতো টলতে টলতেই বেরিয়ে গেলেন! কিন্তু গিয়ে যে কাণ্ড করে বসলেন সেটা তারও ধারণার বাইরে ছিল।

বাসুদেব তখন তানপুরাটা পাশে রেখে চোখ বুজিয়ে বসেছিলেন। বোধ করি কোনো রাগিনীর মূর্তি ধ্যান করছিলেন।

উন্মাদিনীর মতো গিয়ে ভানুমতী তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এবং চুম্বনে চুম্বনে তাকে আচম্বিতে অস্থির করে তুললেন।

প্রথমটায় কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন বাসুদেব। তারপরে সবলে তার বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করার প্রয়াস করতে করতে হুংকার দিয়ে উঠলেন।

—ভানুমতী !

—না না, আমি ছাড়বো না। আমি কিছুতেই ছাড়বো না !

ভানুমতী আরো জোর করে তাকে আঁকড়ে ধরতে লাগলেন। তিনি যত সরিয়ে দেন ভানুমতী ততই তাকে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরেন।

আবার হুংকার দিলেন বাসুদেব।

—ভানুমতী !

—আমি শুনবো না। আমায় মেরে ফেল তুমি। আমি কিছুতেই—

এবার বাসুদেব সজোরে একটা ঝটকা দিলেন।

ভানুমতী পড়ে গেলেন। সামলাতে পারলেন না। ছিটকে পড়ে

গেলেন। প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় পড়ে গেলেন। পড়ে হাঁপাতে লাগলেন। তখনো বস্ত্র পরিবর্তন করেন নি তিনি। পরিধানে তখনো বাসুদেবের সেই ধুতিখানি মাত্র ছিল।

বাসুদেব কম্পিত কলেবরে উঠে দাঁড়ালেন।

সঙ্গে সঙ্গে ভানুমতীও দাঁড়ালেন এবং তরঙ্গভঙ্গের মতো আবার গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাসুদেবের ওপর।

ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিলেন বাসুদেব।

—ভানুমতী, সাবধান।

—না না, আমি শুনবো না।

ভানুমতি আবার এগিয়ে গেলেন।

—ভালো হচ্ছে না ভানুমতী। অত্যন্ত অপরাধ করছো তুমি।

—না, আমি কোনো অপরাধ করিনি। ভালোবাসা অপরাধ নয়।

—ভালোবাসা অপরাধ নয় কিন্তু কামনা অপরাধ। তুমি সাবধান হও। ভুলে যেয়ো না আমি তোমার গুরু। পিতৃতুল্য।

শিউরে উঠলেন ভানুমতী। স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তিনি নীরবে বসে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলেন। বুকের মধ্যে কি একটা অসহ্য যন্ত্রণা পাক খাচ্ছে। লজ্জা অপমানের সুতীব্র যন্ত্রণা।

একি করলেন ভানুমতী! কামনার পাকে পড়ে একি করলেন! এ লজ্জা এখন কোথায় রাখবেন তিনি।

বাসুদেবের দিকে একবার আড় চোখে তাকালেন ভানুমতি। তাকিয়েই চমকে উঠলেন।

এখন কোথায় যাচ্ছেন উনি? বাইরে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে।

সত্যিই বাইরে যাবার কাপড় জামা পরেছেন বাসুদেব। বজ্রগম্ভীর মুখ। কোনোদিকে লক্ষ্য নেই। নিজের জিনিস এখানে থাকতে থাকতে অনেক জমে গিয়েছিল বাসুদেবের। মুখ দিয়ে যে বস্তুকে

একবার ভালো বলেছেন, তৎক্ষণাৎ রাজনারায়ণ সে বস্তু তাঁকে আনিয়ে দিয়েছেন। জামা কাপড় প্রচুর জমে গেছে তার। কিন্তু এখানের কোনো জিনিস নয়। নিজের একখানা ধুতি আর একটা পিরান পরেছে। বাইরে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। আবার টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

বাসুদেব তার নিজস্ব তানপুরাটি হাতে তুলে নিলেন।

আর একটি কথাও নয় ভানুমতীর দিকে আরেকবার ফিরেও তাকালেন না—দৃঢ় পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ভানুমতীও বাধা দিতে পারলেন না। তিনি যেন জড়ে পরিণত হয়েছেন। তাকিয়ে কেবল দেখলেন বাসুদেবের চলে যাওয়া। তারপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন।

সে যে কি দিন রাত্রি গেছে ভানুমতীই জানেন। আজও মনে আছে সে রাত্রির ইতিহাস। ভাষায় সে ব্যথা বেদনা আর লজ্জার কথা প্রকাশ করা যায় না।

প্রকাশ করতে পারেও নি ভানুমতী।

পরের দিন সাশ্চর্যে রাজনারায়ণ জিজ্ঞাসা করলেন—ভানু, বাসুদেব কোথায়?

—জানি না।

সারারাত্রি ঘুমোতে পারেন নি ভানুমতী। কিছু খানও নি। সারারাত কেবল কেঁদেছেন আর ভেবেছেন। এক রাত্রে শরীর তার যেন এক বছরের রুগীর মতো হয়ে গেছে।

রাজনারায়ণ তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে চেয়ে বললেন—তোমার কি হয়েছে? অসুখ করেছে নাকি?

—না তো! কিছু তো হয়নি।

ভানুমতী একবার বাবার মুখের দিকে চোখ তুলেই আবার দৃষ্টি নামিয়ে নিলেন।

আবার জিজ্ঞাসা করলেন রাজনারায়ণ—কোথাও যাবার কথা ছিল কি বাসুদেবের? কোথায় গেলেন তিনি? কাল সন্ধ্যাবেলায়ও তো তাঁর গান শুনেছি।

—জানি না। ভানুমতী আস্তে আস্তে বললেন।

—কি জানো না?

ভুরু কুঁচকালেন রাজনারায়ণ। কি যেন একটা সন্দেহ মনের মধ্যে উঁকি দিতে লাগলো তাঁর।

—কি হল? চুপ করে রইলে কেন ভানু?

তথাপি ভানুমতি নিরুত্তর।

রাজনারায়ণ বললেন—তিনি কি রাগারাগি করে গেছেন?

অবনত মুখে ভানুমতী দাঁড়িয়ে রইলেন। তার শরীর কাঁপছে। এবার রাজনারায়াণ একটু জোরে, ধমকের সুরে বললেন—কি আশ্চর্য! ব্যাপারটা কি হয়েছে কিছুতেই বলবে না! নিশ্চয় তুমি অপমান করেছ তাকে।

—না।

ভানুমতী কেঁদে ফেললেন। জীবনে বাবার কাছে কড়া কথা শোনেন নি ভানুমতী। অনেক অপরাধ করেছেন, তবুও না। আজ বাবার সামান্য ধমকও তাই সহ্য করতে পারলেন না। কেঁদে ফেললেন। রাজনারায়ণ বললেন—না তো, কাউকে কিছু না বলে, শুধু শুধু তিনি চলে গেলেন! এ কখনো হতে পারে না!

রাগে চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে রাজনারায়ণের। একটু থেমে তিনি বললেন—তুমি নিজের ভালো নিজে বুঝতে পারো না? আমার সমস্ত কল্পনা—ছি ছি!

আবার একটু থেমে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ববলেন—আমি বেশ বুঝতে পারছি তুমি কোনো গভীর অপরাধ করেছ। যে জন্যে—

চমকে উঠলেন ভানুমতী। কান্নাভেজা চোখ দুটো একবার বাবার মুখের দিকে তুলে আবার সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিলেন।

রাজনারায়ণ আর কোনো কথা বললেন না। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ভুরু কুঁচকে কি যেন ভাবতে লাগলেন। তারপর পেছনে দুটি হাত জড়ো করে চিন্তাচ্ছন্ন মুখে পায়চারি করতে লাগলেন।

সম্পূর্ণ দুটি দিন অপেক্ষায় রইলেন রাজনারায়ণ। বাসুদেব এলেন না। কোনো খবরও দিলেন না। তখন নিজেই খুঁজে খুঁজে বাসুদেবের ভবানীপুরের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

এর আগে কোনোদিন বাসুদেবের বাড়ীতে আসেননি রাজনারায়ণ। বাইরে থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন—দিব্যি ছোট খাটো বাড়িটি। সামনে আবার ছোট্ট একটু বাগানের মতো। ঢেউ খেলানো পাঁচিল ঘেরা এক কোঁটা বাগান। সেই বাগানে আবার লোহার বাহারী গেট। গেটের দু' ধারে দু'টি কাঁঠালী চাঁপার গাছ। আশ-পাশে কতকগুলি ফুলের গাছ। অজস্র ফুল ফুটে আছ। দৃশ্যটি মনোরম। ভালো লাগলো রাজনারায়ণের।

বাসুদেবকে যতটা গরীব ভেবেছিলেন, বাড়িটা দেখে কিন্তু সে ধারণা বদলে গেল তাঁর। বাড়ির ভেতরে থেকে বাসুদেবের সেই অপূর্ব কণ্ঠ-সংগীত শোনা যাচ্ছে। বাংলা রাগপ্রধান গান করছেন তিনি।

গেটটা খুলে রাজনারায়ণ ভেতরে প্রবেশ করলেন। দু' পা সুড়কী ঢালা পথ। তারপরই শ্বেত পাথরের অর্ধ চন্দ্রাকৃতি একটি বারান্দা। দু'টি সোপান বেয়ে বারান্দায় উঠতে হয়। সোপান দু'টির বর্ণ দুরকম। একটি গাঢ় সবুজ অন্যটি সাদা। সোপানে কয়টি ফুলের টব। শুধু গোলাপের।

রাজনারায়ণ প্রথম সোপানে পা দিতেই তার নজরে পড়লো একটা

থামের আড়ালে চমৎকার একটি কুকুর শুয়ে আছে। চোখ মুখ লোমের ঝামরে ঢাকা আছে।

কুকুরটা একবার মাথা উঁচু করে রাজনারায়ণকে দেখে মুখ গুঁজে আবার শুয়ে পড়ল।

রাজানারায়ণ একটা গোলাপ তুলবেন বলে হাত বাড়ালেন।

সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে ডেকে দাঁড়িয়ে উঠলো।

হাতটা সরিয়ে নিলেন রাজনারায়ণ।

ভেতর থেকে সেই সময় একজন বৃদ্ধ গোছের লোক বেরিয়ে এলেন। সম্ভবতঃ ভৃত্য। রাজনারায়ণের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কাকে চান? কুকুরটা তখনো রাগান্বিত চোখে রাজনারায়ণের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করছে।

লোকটা তার দিকে হাত বাড়িয়ে বললে—এই ঝুমুর, থাম।

বলে আবার রাজনারায়ণের দিকে তাকালে।

রাজনারায়ণ বললেন—বাসুদেববাবুর বাড়ি এইটা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কোথা থেকে আসছেন?

—কালীগড় থেকে।

—ও। দাদাবাবু যেখানে ছিলেন?

—হ্যাঁ। তোমার দাদাবাবুকে একবার খবর দাও।

—দিচ্ছি। আপনি আসুন আমার সঙ্গে। দাদাবাবু এখন গান করছেন।

লোকটির পেছন পেছন রাজনারায়ণ ভেতরে প্রবেশ করলেন। রীতিমত বড় ঘর। চারিদিকে ফরাশ পাতা। এখানে ওখানে অনেকগুলি তাকিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। একদিকে গোটা চারেক মস্ত মস্ত তানপুরা। দুটো হারমোনিয়াম। জোড়া তিন চার তবলা। অন্যদিকে দেওয়াল জোড়া বুক কেশ। তাতে নানা রকমের বই। বাসুদেব ঘরের প্রায় মাঝখানে বসে গান করছে। সামনে জন চারেক ভদ্রলোক বসে

আছেন। একজন হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন। একজন তবলা সঙ্গত করছেন। বসুদেব চোখ বুঁজিয়ে গান করছেন।

যদি পথ বাঁকে নামে গোধূলি সন্ধ্যা রেখা
তবে সে অন্ধকারে পাবি কি তাহার দেখা।....

রাজনারায়ণ আস্তে আস্তে গিয়ে একপাশে বসলেন।

অনেকক্ষণ পরে গান থামলো।

বাসুদেব স্মিত মুখে তানপুরাটা এক পাশে রেখে চোখ তুলে তাকলেন।

---আলিসাহেব অনেক দিন পরে আপনার সঙ্গে গান করতে পেলাম। ভালো সঙ্গত না হলে গান জমে না। গান গেয়ে আরাম পাওয়া যায় না। আলিসাহেব একটু কুণ্ঠিত হাসি হাসলেন তবলাটায় হাত ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে। হারমোনিয়ান বাদকের দিকে তাকিয়ে বাসুদেব বললেন, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না, সমীর!

—কেন, কেন স্যার?

একটু জড়'ড় হয়ে পড়লো সমীর।

বাসুদেব তার কাছ থেকে হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করলেন। ইতিপূর্বে য গানটি গাইছিলেন সেটাই বাজাতে লাগলেন। অদ্ভুত হারমোনিয়াম বাজান বাসুদেব। হঠাৎ একটা রীডে আঙুল দিতেই সেটা বেসুরে বেজে উঠলো।

বাসুদেব সমীরের দিকে চোখ তুলে বললেন—এটা ধরতে পরো নি? আমার কানে খালি একটা বিশ্রী সুর তখন থেকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল। তোমার দিকে তাই বার বার তাকাচ্ছিলাম, তুমি বুঝতে পারো নি?

হাসলেন বাসুদেব। হেসে হারমোনিয়ামটা সরিয়ে রাখলেন।

রাজনারায়ণ স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন বাসুদেবের দিকে চেয়ে।

এতক্ষণ বাসুদেব তাঁকে দেখেন নি। এইবার হঠাৎ তাঁর দিকে

চোখ পড়ে গেল। ছেলেমানুষের মতো মুহূর্তে লাফিয়ে উঠলেন বাসুদেব।

—আরে আপনি! আপনি কখন এলেন? কি আশ্চর্য—

মৃদু হাসলেন রাজনারায়ণ।

—এই একটু আগে। তুমি গান করছিলে ভাই—

—তাই এসে চুপচাপ বসে আছেন?

বাসুদেব উঠে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। রাজনারায়ণের পায়ে হাত দিয়ে এই প্রথম প্রণাম করলেন বাসুদেব।

রাজনারায়ণ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। গদ গদ স্বরে বললেন—থাক, বাবা থাক। বেঁচে থাকো।

আরো আশ্চর্য হয়ে গেলেন রাজনারায়ণ যখন বাসুদেব তাঁকে কাকা বলে সম্বোধন করলেন।

বাসুদেব ঘরের অন্যান্য ভদ্রলোকদের লক্ষ্য করে বললেন—আচ্ছা ভাই, আমাদের আসর উপস্থিত বন্ধ হোক। কিছু মনে করবেন না আপনারা। আমার কাকাবাবু অনেক দূর থেকে এসে গেছেন। তাঁর একটু দেখাশোনা—

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। বেলাও তো হল। আমরা এবার উঠি।

—আলিসাহেব, আবার আসবেন। আমার কসুর মাফ্ করবেন।

আলিসাহেব দাঁতে জিভ কাটলেন।

—এ কি বলছেন ওস্তাদজী। আমি আবার কাল আসবো। সমীরবাবুর সঙ্গে আসবো।

একে একে সকলে নমস্কার বিনিময় করে বিদায় নিলেন।

এমন যত্ন! এমন আতিথেয়তা পাবেন আশাও করতে পারেননি রাজনারায়ণ। বাড়িতে একটা রাঁধুনি আর দুটি ভৃত্য। এছাড়া

বাসুদেবের বাড়িতে আর কেউ নেই। এরাই যেন বাড়ির সর্বেসর্বা। বাড়ি দেখাশোনার ভার সবই এদের হাতে। বাসুদেব যেন এদেরই আশ্রিত।

বাসুদেব বললেন—আমি আর কদিন বাড়িতে থাকি। বাড়ি তো ওদের। আর ওই যে বুড়ো মাধবদা; ও বাবার আমলের লোক। আমায় তো কোলেপিঠে করে ওই মানুষ করেছে। তরুদিও কমদিনের নয়। তরুদির মা আমাদের বাড়িতে কাজ করতেন। এখান থেকেই তরুদির বিয়ে হয়। বাবাই দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কপাল মন্দ। এক বছরের মধ্যেই তরুদি বিধবা হয়ে এখানে ফিরে এলেন। সেই থেকেই আছেন আমার মায়ের, আমার বোনের জায়গা দখল করে।

অনেক কথাই রাজনারায়ণের সঙ্গে বাসুদেবের হল। সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজনারায়ণ রইলেন। বাসুদেবের বাড়িতে আহারাদি করলেন। কিন্তু কিছুতেই জানতে পারলেন না বাসুদেব কালীগড় থেকে কেন হঠাৎ চলে এলেন। এবং কেন আর যেতে রাজী হচ্ছেন না। বহু অনুনয়, বিনয়, অনুরোধ উপরোধ করেও কোনো ফল পাওয়া গেল না। কেবল এইটুকু জানতে পারলেন ভানুমতী শর্ত ভংগ করেছেন, তাই তিনি তাঁকে আর গান শেখাবেন না।

রাজনারায়ণ এবার কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন—বাবা, সে যদি অপরাধ করে থাকে তো আমার কথায় এবারের মতো তাকে মার্জনা করো।

অধোবদনে হাসলেন বাসুদেব। বললেন—সব অপরাধ মার্জনা করা যায় না কাকাবাবু। তবে আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করছি। ভানুমতীর তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে দিয়ে ওকে সংসারী করে দিন।

—বিয়ে! চমকে উঠলেন রাজনারায়ণ। কী একটা সন্দেহ তার মনের মধ্যে পাক খেয়ে গেল। একটু গুম হয়ে থেকে বললেন—বিয়ে—

তা মন্দ বলোনি। কিন্তু বাবা, তোমারও তো এখুনি প্রায় বিয়ে করার দরকার। তোমার তরুদিও সেই কথা বলছিলেন।

হো হো করে হেসে উঠলেন বাসুদেব।

—তরুদি বলছিলেন নাকি?

—বলছিলেন। আর সেটা দরকারও তো দেখতে পাচ্ছি।

একটু চুপ করে থেকে মাথা নাড়লেন বাসুদেব।

—না, কাকাবাবু। বিয়ে করার কোনো প্রয়োজন আমার নেই। আপনাকে বলতে সংকোচ নেই—বিয়ে করার কোনো কল্পনা কোনোদিনই আমার নেই।

·· তুমি কি বিয়ে করবে না?

—না।

—সে কি! বিয়ে না করলে চলবে কেন?

—আপনাদের আশীর্বাদ সঙ্গে থাকলে চলায় কোন বাধা হবে না। জীবনে আমি গীত আর গ্রন্থ ছাড়া কিছু চাই না। কোনো কামনাও নেই।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রাজানারায়ণ। কিন্তু আর কিছু বললেন না।

বৈকালী জলযোগ এবং চা পানের পর রাজনারায়ণ আর একবার কালীগড়ে যাবার জন্যে বাসুদেবকে অনুরোধ করলেন।

বাসুদেব হাত জোড় করে বললেন—এখন নয়। ভানুমতীর বিয়েতে যাবো।

রাজনারায়ণ বললেন—আচ্ছা যাও কি না যাও দেখবো। ভানুমতী এসে তোমার পায়ে ধরে অনুরোধ জানালে দেখি তুমি কেমন করে উপেক্ষা করো। এ বুড়োকে উপেক্ষা করতে পারো, তাকে পারবে না।

রাজনারায়ণের মনে তখনো আশা।

বাসুদেব হাসতে লাগলেন। কোনো উত্তর দিলেন না।

এরপর অনেকদিন কেটে গেল। বাসুদেব আর সেই থেকে কালীগড়ে আসেননি। ভানুমতী নিজে গিয়ে হাতে পায়ে ধরে, নিজের অপরাধ স্বীকার করে, ক্ষমা চেয়েও তাকে ফিরিয়ে আনতে পারেননি। অবশ্য ভানুমতীর নিজের যাবার ইচ্ছা এবং সাহস প্রথমে হয়নি। রাজনারায়ণের তাড়ায় তাকে যেতে হয়েছিল।

কিন্তু সে কথা যাক! সেজন্য কারো দিন আটকে থাকেনি। তারপর দুটো বছর দেখতে দেখতে অতীতে মিলিয়ে গেল। বাসুদেবের আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। বাসুদেবও খবর দেওয়ানেয়া করেননি। ভানুমতীরাও না।

এই সময় হঠাৎ একদিন ভানুমতীর বিয়ে হয়ে গেল

বিয়ের পর ভানুমতীর দিনগুলি মন্দ কাটাছল না। মাঝে মাঝে অবশ্য বাসুদেবের কথা মনে পড়তো তবে তা নিতান্তই সাময়িক।

রাজনারায়ণও কন্যা জামাতা নিয়ে বেশ আনন্দে ডুব দিয়েছিলেন। আরো আনন্দ বেড়ে গেল বছর দেড়েক পর যেদিন সংসারে নতুন অতিথি-রূপে আদিত্যের আবির্ভাব হ'ল।

ভানুমতীরও নতুন জীবন, নতুন আস্বাদ। স্বামী-পুত্র-পিতা নিয়ে নতুন সংসার, নতুন চিন্তা। কিন্তু এ চিন্তার পথ পরিবর্তন করল কিছুদিন পর থেকেই। কেন এমন হ'ল ভানুমতীর? কেন তার চিত্ত এমন অসংযমী হয়ে উঠলো?

বিয়ের দু'বছর পরে মনে হ'ল স্বামী তার মনের মতো হয়নি। স্বামী তার বাসুদেবের মতো সুরূপ নয়। স্বামীর সঙ্গ আর ভালো লাগে না তার। ভালো লাগে না বলরামকে।

ভানুমতী অতি মাত্রায় অহংকারী। ছেলেবেলা থেকেই অহংকারী। ভানুমতীর সামান্য জিনিসে মন ওঠে না। তিনি জমিদারের মেয়ে, তিনি রূপসী, তিনি সংগীতজ্ঞা এবং শিক্ষিতা এ ধারণা সব সময় তাঁকে সচেতন করে রাখে।

আদিত্যনারায়ণ জন্মাবার পর থেকেই স্বামী বলরামকে তিনি আরো বেশি করে উপেক্ষা করতে লাগলেন। গোড়া থেকেই এ উপেক্ষার ভাব ছিল তবে তেমন বোঝা যেত না। ক্রমেই সেটা প্রকট হয়ে উঠতে লাগলো। আরো হ'ল আদিত্য জন্মাবার পর। সন্তান তিনি কামনা করেননি। মা হবার কোন আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে ছিল না। এ তার কি হ'ল? বলরাম এমন করে কেন তার সর্বনাশ করলে! এই নিয়েই মাঝে মাঝে স্বামীর প্রতি বিদ্রূপাত্মক কথাও বর্ষণ করতে লাগলেন। ছেলের প্রতিও তেমন যত্ন দেখা গেল না।।

কিছুদিনের মধ্যেই ভানুমতীর মন ব্যভিচারে লিপ্ত হ'ল।

গোপনে সেই রতিকান্তর সঙ্গে পত্র বিনিময় হতে লাগলো। মাঝে মাঝে সকলের অলক্ষ্যে রতিকান্তর গোপনে আসা যাওয়াও সুরু হ'ল। রতিকান্ত এসে ওই বাগান বাড়িতে লুকিয়ে থাকে। খালি বাগান বাড়ি কেউ কোথাও নেই। এদিকে কেউ আসা-যাওয়াও করে না—বাসুদেব চলে যাবার পর থেকে। কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। বাগান-বাড়িতেই প্রণয় পালা অভিনীত হতে লাগলো। ভানুমতী যেন ক্রমেই অন্য রকম হয়ে যাচ্ছেন।

রাজনারায়ণ তখন অসুস্থ। অত্যধিক রক্তের চাপে ভুগছেন চলাফেরা করতে পারেন না।

বলরামেরও কী যেন হয়েছে—পাকস্থলী সংক্রান্ত অসুখ। মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন বিছানায় পড়ে থাকে। প্রায় অনাহারেই পড়ে থাকে।

ভানুমতীর লক্ষ্য নেই কোনো দিকে। পিতার প্রতি লক্ষ্য নেই, স্বামীর প্রতি নেই। এমন কি সন্তান আদিত্যের প্রতিও নেই। তিনি নিজেকে নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত।

বাড়ির দাসী চাকর রুগী দুটির তত্ত্বাবধান করে। আদিত্যনারায়ণের পরিচর্যা করে।

ভানুমতী নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।

চারিধারে গুঞ্জন। গুঞ্জন ভানুমতীকে নিয়ে। চাপা সুরে নানা আলোচনা। হাসাহাসি, কানাকানি। ইশারা ইঙ্গিত।

ব্যাপারটা আর গোপন নেই। সকলেই যেন জানতে পেরেছে বলে মনে হল ভানুমতীর। একটা কঠিন হাসি তার মুখে ফুটে ওঠে। জানুক! বয়ে গেল। আস্তে আস্তে একটা বেপরোয়া ভাব জেগে ওঠে ভানুমতীর মনে।

ঠিক এমনি সময় একদিন অকস্মাৎ কী এক আভ্যন্তরীণ গভীর যন্ত্রণায় রাত্রি শেষে মারা গেলেন বলরাম।

ভানুমতী তখন বাগানবাড়িতে অভিসারে গেছেন। ভিতর বাড়ির চিৎকার শুনে যখন তিনি এলেন তখন সব শেষ হয়ে গেছে।

বজ্রাহতের মতো স্থির হয়ে দাঁড়ালেন ভানুমতী স্বামীর মৃত দেহের পাশে। একটু অনুতাপ একটু বেদনা তার মনটাকে একবার মুচড়ে দিলে! তারপর আদিত্যকে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি কেঁদে উঠলেন। কিন্তু কেন কাঁদলেন? তিনি তো কোনোদিন স্বামীকে ভালোবাসেননি।

রাজনারায়ণ চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় গিয়েছিলেন। বলরামের মৃত্যুর খবর সেইখানেই পেলেন। এবং পেয়ে তিনি আরো অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

কালীগড়ে ফিরে আসতেই ভানুমতী তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে কেঁদে উঠলেন। আমার কি হল বাবা!

রাজনারায়ণ গম্ভীর মুখে তাঁর মাথায় একটা হাত রাখলেন। কোন কথা বললেন না। বলার মতো কথাও ছিল না তাঁর। ভানুমতী তাঁর বুকের পাঁজরার চাইতেও বেশি। ভানুমতী তাঁর একমাত্র সন্তান। কিন্তু ভানুমতী এ কি করলে? বলরামের মৃত্যুর জন্যে দায়ী কে?

সব জানেন রাজনারায়ণ। সব বোঝেন! তবুও কন্যাকে শাসন করা তো দূরের কথা—একটু চড়া কথাও বলতে পারলেন না।

ভানুমতীর স্বভাব চরিত্র গোপন নেই রাজনারায়ণের কাছে। সব জানেন তিনি। তবুও তো কিছু বলতে পারেন না।

কেন পারেন না? পারেন না এই জন্যে যে, তিনি নিজের চরিত্রের প্রতিবিম্ব দেখতে পান কন্যা ভানুমতীর মধ্যে। তা ছাড়া তাঁর একমাত্র অতি আদরের সন্তানকে শাসন করবে মনে হলেই বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠে। এ দুর্বলতাকে তিনি কিছুতেই শায়েস্তা করতে পারেন না। অতএব মুখ চোখ বুজিয়ে তাঁকে সব সহ্য করতে হয়। উপায় নেই। নিরুপায় তিনি। হাল ছেড়ে দিয়েছেন। যা ইচ্ছে করুক ভানুমতী।

লোকে নিন্দে করবে? করুক সামনে তো কেউ কিছু বলতে সাহস করবে না জমিদারের মেয়ের নামে? আড়ালে বলবে বলুক। আড়ালে রাজার মাকে ডাইনি অনেকেই বলে। রাজার মায়ের তাতে কিছু যায় আসে না। ভাবেন জমিদার রাজনারায়ণ। গভীর ভাবে ভাবেন। কিন্তু শুধু ওই ভাবেনই, আর কিছু না। ভাবেন, দেখেন আর গুঞ্জন শোনেন।

ইদানীং রাজনারায়ণ আরো গম্ভীর হয়ে গেছেন। আরো অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এখন প্রায় সদা সর্বদাই শয্যায় পড়ে থাকেন। আগে ভানুমতীর সঙ্গে যেটুকু কথা বলতেন, গল্পস্বল্প করতেন, বলরাম মারা যাবার পর তাও বন্ধ করে দিলেন। এখন ভানুমতীকে সামনে দেখলে চোখ বুজিয়ে ফেলেন।

অসহ্য। ভানুমতী তার চোখে অসহ্য। লোকের ছেলেই সাধারণত অসচ্চরিত্র হয়। কিন্তু রাজনারায়ণের কপালে সবই উল্টো। তাঁর মেয়ে অসচ্চরিত্রা!

এখন বেশ বুঝতে পারেন রাজনারায়ণ, কেন বাসুদেব অমন সহসা এখান থেকে চলে গিয়েছিলেন? কেন আর ভানুমতীকে গান শেখাতে

রাজী হন নি! দেব চরিত্রের ছেলে বাসুদেব! তিনি কি ব্যভিচার সইতে পারেন? ভাবতে ভাবতে রাজনারায়ণের বুক নিঙড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। বলরাম মারা গেলেন। ভানুমতীর জন্যেই মারা গেলেন। কিন্তু স্মৃতি তিনি রেখে গেছেন—অদিতানারায়ণকে।

হ্যাঁ। অদিত্য তারই সন্তান। এ বিশ্বাস রাজনারায়ণের আছে। হয়তো বিশ্বাস থাকতো না, যদি না বলরামের মতো আদিত্যকে দেখতে হতো। আদিত্যর মুখের সঙ্গে বলরামের মুখের আশ্চর্য সাদৃশ্য! এখন সারাদিন রাজনারায়ণের কাটে আদিত্যকে নিয়েই। এখন ভানুমতীর স্থান দখল করছে আদিত্য।

রাজনারায়ণ নতুন স্বপ্ন রচনা আরম্ভ করেছেন আদিত্যকে নিয়ে। ছেলেটাকে মানুষ করতেই হবে। ছেলেটা যেন তার বাপের নাম রাখে।

স্বামী মারা যাবার পর ভানুমতীও নিজের চরিত্র সংশোধনের অনেক চেষ্টা করলেন। এতদিন গান বাজনা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আবার আরম্ভ করলেন। গানে নাকি সব ভোলা যায়।

বাসুদেব বলেছিলেন—গানের মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে সমস্ত আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সুর ব্রহ্ম। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সেই সুরের উপাসনা করতে পারলে কোনো পাপ চিত্তকে স্পর্শ করতে পারে না।

ভানুমতী আবার গান গাইতে আরম্ভ করলেন।

আজ বাসুদেবকে বড় বেশি মনে পড়ে ভানুমতীর। বাসুদেব ইচ্ছা করলে তাকে এই দুর্গন্ধ পরিপূরিত পাঁক থেকে উদ্ধার করতে পারতেন। সেদিন যদি বাসুদেব এতটুকু কৃপা করতেন তাহলে বোধ হয় তার আজ এ অবস্থা হতো না।

বাসুদেব এখন কোথায় আছেন তিনি জানেন না। কি করছেন তাও জানেন না। শুধু জানেন, বাসুদেব তার মনের কন্দরে স্থির হয়ে বাস

করেছেন। সেই প্রথম দর্শন থেকেই বাসুদেবকে তিনি একান্ত আপন করে নিয়েছেন। আজো বাসুদেবকে ভুলতে পারেন নি তিনি। ভোলা সম্ভবও নয়।

বাসুদেব বলেছিলেন সংসার করবেন না। বিবাহ করবেন না। গীত আর গ্রন্থ নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেবেন। হয়তো তাই দিচ্ছেন। হয়তো দিচ্ছেন না। এতদিন বিবাহ করে হয়তো সংসার করছেন।

ভাবতেই ভানুমতীর বুকের মধ্যে কেমন জ্বালা করে উঠলো। কে সে মেয়ে! কেমন সে মেয়ে? যাকে বাসুদেব বিবাহ করতে পারেন! কল্পনায় যেন তিনি দেখতে পান একটি নারীকে। সে নারী যেন সগর্বে তার দিকে চেয়ে হাসছে। বিদ্রূপের হাসি। সীমন্তে তাঁর জ্বল্ জ্বল্ করছে সিন্দুর রেখা। ললাটে মস্ত একটা সিন্দুরের টিপ। রূপসী একটি নারী তার দিকে চেয়ে হাসছে। শুধু হাসছে না। বাসুদেবের বক্ষদেশে তার মাথা—বাসুদেবের গলায় তারদুটি বাহু বেষ্টিত। চক্ষু বাসুদেবের চক্ষে স্থির। বক্ষবাস মুক্ত। অর্ধনগ্ন সেই সুন্দরী নারীর অধরে বংকিম হাসি।

ভানুমতী কল্পনার নেত্রে দেখতে পান—সেই নারীর অধরে মাঝে মাঝে বাসুদেবের অধর সংযুক্ত হচ্ছে। বাসুদেবের সারা মুখে তৃপ্তির প্রসন্ন ছায়া।

জ্বলে ওঠে। ভানুমতীর বুকের মধ্যে জ্বলে উঠে। সে অসহ্য জ্বালা সহ্য করতে পারেন না তিনি। নিজেকে সংযত রাখতে পারেন না। তাই তো এমন অসংযমী হয়ে উঠলেন তিনি। তাই তো এমন বাধাহীন ভাবে যৌবন সম্ভোগে লিপ্ত হলেন। অগ্র পশ্চাৎ ভাবলেন না। প্রথম বসন্ত যৌবন যমুনায় যে ঢেউ তুলেছিল তাকে গোপনে আহ্বান জানালেন। স্বামী সঙ্গ যথেষ্ট মনে হল না তাঁর। সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়েও নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না।

কিন্তু এ কি হল? একি করলেন তিনি? স্বামীকে হত্যা করলেন!

হাতে করে অবশ্যই হত্যা করেননি। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর কারণ তিনিই। এ সত্য গোপন নেই তাঁর কাছে। তাই স্বামীর মৃত্যুর পর অনুতাপ এলো তাঁর। তিনি নিজেকে সংযত করার চেষ্টায় মন দিলেন। আবার সংগীত চর্চা আরম্ভ করলেন ভানুমতী। আর সেই সঙ্গে পুত্র আদিত্যকে যথার্থ মানুষ করার কাজে মন দিলেন। তবে দিনের অধিকাংশ সময় আদিত্যের দাদামহাশয় রাজনারায়ণের কাছেই কাটে। দাদুও নাতী অন্ত প্রাণ নাতীও তাই।

গ্রামের অনেকেই জমিদার বাড়িতে আসে যায়। অনেক আলোচনা হয়। রাজনারায়ণের যৌবনের সঙ্গী যে দু চার জন আজো বেঁচে আছেন এবং গ্রামেই আছেন —তাঁরা মাঝে মাঝে আসেন রাজনারায়ণকে দেখতে। তাঁদের দেখলেই অতীতকে মনে পড়ে যায় রাজনারায়ণের। মনে পড়ে যায় সেই চরম স্ফুর্তির দিনগুলি! সেই কামিনীবাঈজী, অলোকাবাঈজী, বেদানাবাঈ, আতরবিবি! আরো কতো নারী মুখ মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। কতো বড় বড় ওস্তাদ। সংগীত শিল্পী, যন্ত্রশিল্পী।

বাগানবাড়িটা তখন দিবারাত্রি জমজম করতো। নূপুর নিক্কনে, বাদ্য-যন্ত্রে, আর সংগীতে তারপর একদিন সহসাই সব থেমে গেল। নিশ্চুপ হয়ে গেল। মনোরমা মারা গেলেন। ভানুমতীর ভার রাজনারায়ণের হাতে তুলে দিয়ে।

সেই থেকে গান বাজনা থেমে গেল। অনেকদিন থেমেছিল। আবার বেজে উঠলো একদিন ভানুমতী বড় হতে। বাসুদেব এলেন। অপূর্ব কণ্ঠস্বর নিয়ে এলেন। ভানুমতীকে গান শেখাতে এলেন। তারপর সে গানও থেমে গেল একদিন।

বাসুদেব চলে গেলেন। অকস্মাৎ চলে গেলেন। আর তাঁকে ফেরানো গেল না। সাধ্যসাধনা করেও ফেরানো গেল না। অভিমান

করে চলে গেলেন তিনি। অপমানিত হয়ে চলে গেলেন। ভানুমতী তার যোগ্য সম্মান দিতে পারেনি। তার শর্ত ভঙ্গ করেছে। সন্ন্যাসী বাসুদেবকে বড় ভুল বুঝেছেন তিনি। ভানুমতীও তাকে বুঝতে পারেনি। কিন্তু সে থাক। যা হবার হয়ে গেছে। এখন বাসুদেবকে দেখতে বড় ইচ্ছে হয় রাজনারায়ণের। ইচ্ছে হয় তার গান শুনতে।

গান অবশ্য মাঝে মাঝে শুনতে পান। শুনতে পান রেডিওর মারফৎ। আর গ্রামোফোন রেকর্ডে। কিন্তু তাতে তাঁর মন ভরে না। বাসুদেবের একটা বড়ো ফটোও ছিল তাঁর ঘরে। কিন্তু কিছুদিন থেকে সেটাও আর দেখতে পাচ্ছেন না। বোধহয় ভানুমতী নিয়ে গেছে! ভানুমতীকে জিজ্ঞাসা করাও হয়নি। করবো করবো করেও ভুলে যান। মনের অবস্থা মোটেই ভালো নয় তাঁর।

এমনি করে সংসারের দিনগুলি একে একে কেটে যায়। রাজনারায়ণ জীবনের শেষ দিনের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকেন।

আদিত্য এখন আর শিশু নয়, বালক। প্রায় সাত বছর বয়স হল তার। তার জন্যে মাস্টার নিযুক্ত হয়েছে। সামনের বছর থেকে ইস্কুলে ভরতি হবে।

ভারি বুদ্ধিমান ছেলে। তেমনি পরিষ্কার মাথা।

রাজনারায়ণ ছেলেটাকে দেখেন আর ভাবেন। ভাবেন আর দেখেন। ছেলেটাকে মানুষ করতে পারলে, মানুষের মতো মানুষ হবে। লেখাপড়ায় ওর বাবার মতোই হবে। দেখতেও। যত বড়ো হচ্ছে ওর বাপের মতোই হচ্ছে। হাবভাব-কথাবার্তা সব সেই রকম। কথা বলে কম। ভাবে বেশি।

কিন্তু ছেলেটা বাঁচবে কি ভানুমতীর কপালে? যদি বাঁচে ভানুমতীর অনেক ভাগ্য।

ভানুমতীর মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করে আজকাল অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন রাজনারায়ণ। ভেবেছিলেন এবার শুধরে গেলেন

ভানুমতী। যৌবনের তাড়নায় অনেক ছেলে মেয়েই অনেক অন্যায় করে বসে। তারপর সেই অন্যায় বুঝে যে চরিত্রের সংশোধন করে তাকে আর ঠেলে দেওয়া উচিত নয়। তাকে ঠেলে দিলে মানবধর্মকে অসম্মান করা হয়। কন্যা ভানুমতীকে ক্ষমা করেছেন রাজনারায়ণ। আজকাল ভানুমতী প্রায় সময়ই গান করেন। বাসুদেবের শেখানো গান। সম্প্রতি খবরের কাগজে একটা খবর দেখে পিতাপুত্রী দুজনেই। কেন জানি না, ভয়ংকর আনন্দ পেয়েছেন। সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে—প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী বাসুদেব এ বৎসর শ্রেষ্ঠ সংগীত সাধক হিসাবে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার লাভ করেছেন।

সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে বাসুদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

রাজনারায়ণ বল্লেন—এ সম্মান তো এতদিন অনেক আগেই তার পাওয়া উচিত ছিল। আদিত্য সেখানে উপস্থিত ছিল। সে মায়ের এবং দাদামশায়ের কথা অবাক হয়ে শুনতে শুনতে প্রশ্ন করলে—কে মা? কার কথা বলছ?

ভানুমতী স্মিতমুখে তার দিকে চেয়ে বললেন—আমার ওস্তাদ রে। আমি এঁর কাছে গান শিখতুম।

—ধ্যেৎ! হ্যাঁ দাদু?

আদিত্য দাদামশায়ের পানে তাকাল।

রাজনারায়ণ হাসতে হাসতে বললেন—হ্যাঁ দাদু। তোমার মা এঁর কাছে গান শিখতেন।

খবরের কাগজে বাসুদেবের যে ছবিটা বেরিয়েছিল সেইটার দিকে অনেকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থেকে আদিত্য বললে—কই আমি তো এঁকে দেখিনি কখনো।

—না তুমি দেখোনি।

রাজনারায়ণ বললেন—তুমি জন্মাবার অনেক আগেই ইনি তোমার

মাকে গান শেখাতেন। ওই বাগানবাড়ীতে তোমার মা এঁর কাছে গান শিখতেন।

বলতে বলতে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন তিনি।

ভানুমতীও চেপে চেপে একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। ধীরে ধীরে তার মন তখন শূন্যে পাখা মেলেছে। মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে। হাসি মিলিয়ে গেছে। আদিত্য তখনো সেই ছবিটার দিকে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে।

—আচ্ছা দাদু!

—বলো ভাই।

—আচ্ছা, এঁকে তো সন্ন্যাসীর মতো দেখতে।

—সন্ন্যাসীই তো উনি।

—তবে এঁর কাছে মা কি করে গান শিখতেন?

—কেন? সন্ন্যাসী কি গান করতে জানে না?

ভানুমতী আস্তে আস্তে উঠে গেলেন সেখান থেকে। উঠে গিয়ে নিজের ঘরে গেলেন। তারপর নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদে গেলেন। ছাদে গিয়ে বাগান বাড়ির দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন।

অনেক দিন পরে আজ অকারণে তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগলো। কাঁদতে লাগলেন তিনি। অনেকক্ষণ ধরে অনেক কান্না কাঁদলেন। বাসুদেবকে মনে করে কাঁদলেন। কেন বাসুদেব তাঁর জীবনে দেখা দিয়েছিলেন।

এদিকে দাদু নাতীর গল্প ঘরের মধ্যে রীতিমত জমে উঠেছিল।

রাজনারায়ণ শোনাচ্ছিলেন, কেমন করে বাসুদেবের সঙ্গে তাঁর প্রথমে আলাপ হয়। কেমন কার তিনি তাকে এইখানে নিয়ে আসেন। কেমন করে ভানুমতীর গান শেখাবার ভার তিনি গ্রহণ করেন। আদিত্য অবাক হয়ে শুনছিল। গল্প শুনতে ভীষণ ভালোবাসে সে। রাজনারায়ণ থামতেই তাই সে জিজ্ঞাসা করলে—দাদু তারপর?

—তারপর আর কি! তোমার মা তার কাছে গান শিখতে লাগলেন।

—কি মজা! দাদু এখন তিনি কোথায়?

—ঠিক জানি না ভাই।

—দাদু, আমি তার কাছে গান শিখবো।

—শিখবে। আগে বড় হও। তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাব। নিয়ে গিয়ে বলবো—আমার এই দাদুটাকে গান শেখাও। এর মাকে শিখিয়েছ, আবার একে শেখাও।

আদিত্য আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো।

রাজনারায়ণ তার আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। তাঁর শেষ জীবনের সাথী এই ছোট্ট ছেলেটিকে খানিক আনন্দ দিয়েই তাঁর আনন্দ। আদিত্য আর একটু ঘেঁষে বসলো তাঁর কাছে। গায়ে একটা হাত রাখলে।

—দাদু আবার বলো।

—কি ভাই? কি বলবো?

—ওই গল্পটা।

—গল্প।

হেসে উঠলেন রাজনারায়ণ। হেসে উঠলেন তাকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে।

—এ গল্প নয় দাদু। এ সত্যি কথা।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই সত্যি কথার গল্পটাই আবার বলো।

—ও। ওইটাই আবার বলবো?

মাথা নাড়লে আদিত্য।

রাজনারায়ণ আবার বলতে লাগলেন।

—তোমাকে নিয়ে যাবো বসুদেবের কাছে। বলবো, এর মাকে গান শিখিয়েছ, এবার একে শেখাও। এ আমার দাদুভাই।

একটা নিঃশ্বাস মোচন করে রাজনারায়ণ বললেন—কিন্তু ভাই, তিনি যা সর্ত বলে দেবেন সে সর্ত যেন ভেঙো না।

—না।

আদিত্য সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে জানালে, সে সর্ত ভাঙবে না।

রাজনারায়ণ তার দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন। কী সরল! কী অকপট স্বীকারোক্তি! ভাবতে লাগলেন রাজনারায়ণ—এই ছেলে বড় হয়ে কেমন হবে। এই সরলতা তখনো কি থাকবে! এমনি সরল তো ভানুমতী একদিন ছিল। কিন্তু সে সরলতা রইলো কি।

চিন্তিত রাজনারায়ণের পানে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আদিত্য বললে—ও দাদু, চুপ করে আছ কেন? গল্প করো না। ও দাদু—

—অঁ্যা।

চমকে উঠলেন রাজনারায়ণ। একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করে বললেন—তোমার মা কোথায় গেলেন ভাই?

—জানি না। তুমি একটা গল্প বলো।

—আবার কি বলবো রে?

—হ্যাঁ বলো।

তার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে হাসতে লাগলেন রাজনারায়ণ।

—কই বলো।

—এই যে বলি ভাই। ভুলোটা একটু তামাক দিয়ে যাক। তামাক খেতে খেতে গল্প বলবো।

—আমি ভুলোকে এখুনি ডেকে আনছি।

বলেই আদিত্য তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাজনারায়ণ তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। শেষ বয়সের শেষ সঙ্গী রাজনারায়ণের। একে নিয়েই তার দিনরাত এখন বেশ কেটে যায়। আর কাউকে প্রয়োজন হয় না। কোথাও যেতে পারেন না তিনি। যানও না। আগে আত্মীয় স্বজনের বাড়ি

কাজে কর্মে তিনি গিয়ে দাঁড়াতেন। সামাজিকতার প্রতি তাঁর লক্ষ্য খুব। আজকাল আর পারেন না। শরীরও অপারগ। মনও চায় না। এখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সামাজিকতা বজায় রাখা হয় না। তবে যে সব ক্ষেত্রে একেবারে না গেলেই নয়, সেখানে ভানুমতী যান। একজন পুরানো চাকর নিয়ে ভানুমতী যান। আদিত্য দাদুর কাছে বাড়িতেই থাকে। সে মায়ের চাইতে দাদুর ভক্ত বেশি। তা ছাড়া রাজনারায়ণও তাকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। ভানুমতীর এতে কোনো দুঃখ হয় না। বরং আনন্দই হয়। কোনো ঝামেলা সইতে পারেন না তিনি।

সামাজিকতা রক্ষা করতে ভানুমতীও খুব ভালোবাসেন। তবে যেখানে সেখানে যাওয়া পছন্দ করেন তিনি। তার পদমর্যাদায় এবং আত্মমর্যাদায় বাধে। আবার একেক জায়গায় স্বেচ্ছায় যেতে চান আগে খুবই এখানে সেখানে যেতেন। কাজকর্মের বাড়িতে সুন্দর ছেলে ছোকরা দেখলে তার সঙ্গে আলাপ করতেন হাসাহাসি করতেন পরিবেশনকারী যুবকদের সঙ্গে পরিহাস করতেন। ঠাট্টা তামাস করতেন। বেশ লাগতো। কোনো কোনো জায়গা থেকে কোনো কোনো সুন্দর ছেলেকে মনে বেঁধেও নিয়ে অসতেন এবং অনেকদিন ধরে তাকে নানা রকম করে ভাবতেন।

কিন্তু বাসুদেব আসার পর সমস্তই বন্ধ করে দেন তিনি। মন তার বাসুদেবময় হয়ে ওঠে। তারপর বাসুদেব চলে গেলেন তাকে উপেক্ষা করে। আবার তিনি পূর্বের জীবন চিন্তায় ফিরে গেলেন।

বিবাহ হল। বিবাহের পর তিনি যেন ছাড়পত্র পেলেন। স্বামীকে সামনে রেখে যৌবন সম্ভোগে মেতে উঠলেন। আরো মাতলেন আদিত্য জন্মাবার পর থেকে। যৌবন ফুরিয়ে আসছে। কাজেই তাকে পুরোপুরি ভোগ করে নিতে চাইলেন তিনি। এই সময়ই স্বামীর মৃত্যু হল। একটা প্রচণ্ড আঘাত পেলেন তিনি। সেই ধাক্কায় নিজের পথ

পরিবর্তন করার প্রয়াস করতে লাগলেন। নিজের ভ্রান্তি বুঝতে পারলেন।

আবার শুরু করলেন সাবেকী দিনের মতো গান বাজনা।

কিছুদিন মন্দ কাটলো না। তারপর আবার তাতে ভাটা পড়লো। আবার নানা চিন্তা এসে তার মন অধিকার করে বসলো। আবার মনটা পাখনা মেলে বেড়াতে লাগলো আকাশে ওড়বার জন্যে। বহু চেষ্টায়ও তাকে যেন আয়ত্তে রাখা যাচ্ছে না। মনে করলেন পুত্র আদিত্যের মুখের দিকে চেয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখবেন। ভুলিয়ে রাখবেন বাবার সেবার মধ্যে। ভুলিয়ে রাখবেন সংসারের নানা কাজে নিজেকে আবদ্ধ করে।

চেষ্টার ত্রুটি করেননি তিনি। কিন্তু পারলেন না। হয়তো পারতেন, যদি না মামাতো বোন অমিতার বিয়েতে কলকাতায় যেতেন। সেখানে গিয়েই আবার পচা পাঁকের মধ্যে পড়ে গেলেন।

বেশি দিনের কথা তো নয় সে; এই মাত্র মাস কয়েক আগে।

ছি ছি! একি করে বসলেন তিনি। কি করে বসলেন!

সারা অঙ্গে তার সেই পাঁকের দুর্গন্ধ। প্রথম সে গন্ধ প্রকট হয়ে উঠেছে। লোকেও হয়তো এবারে নাক সিঁটকোবে।

এখন কি উপায় করবেন ভানুমতী? কি উপায় করবেন? এ লজ্জা কেমন করে গোপন করবেন।

ভানুমতীর রাত্রে ঘুম হয় না। আহারে রুচি হয় না। দিবারাত্র অস্বাচ্ছন্দ্য আর অসুস্থ ভাব। ঠিক আদিত্য হবার আগে এমনি অসুস্থ বোধ করেছিলেন তিনি। বড়োই বিপদে পড়লেন। উদ্ধারের পথ কোথাও দেখতে পেলেন না। আজ স্বামীকে বড় বেশি মনে পড়ে তার। স্বামী থাকলে এ দুশ্চিন্তায় পড়তে হতো না তাকে। ঘটনাটা আনুপূর্বিক ভাববার চেষ্টা করেন ভানুমতী। কেন এমন হল, কি করেই বা সম্ভব

হল—ভাববার চেষ্টা করেন। ভাবতে ভাবতে তলিয়ে যান, হারিয়ে যান সেই ভাবনার তলায়।

সুরঞ্জন তার মামাতো ভগ্নীপতি। অমিতার বড় বোন সবিতার স্বামী। কিন্তু সবিতা বেঁচে নেই। বিয়ের মাত্র এক বছর পরেই সে মারা যায়। প্রসব হতে গিয়ে মারা যায়। সেই থেকে সুরঞ্জন আর বিয়ে করেনি। সুরঞ্জন মৃতদার।

সম্পর্কে সুরঞ্জন ভানুমতীর স্নেহের পাত্র। সবিতা বয়সে অনেক ছোট ছিল। তার বিয়ের পর দু' এক বার সবিতাসহ কালীগড়ে এসেছেও। সুরঞ্জন ছেলেটি বড় ভালো। দেখতে শুনতে সবই ভালো। রংটা একটু চাপা বটে তবে মুখ চোখ নাক আর সর্বোপরি স্বাস্থ্যটি চমৎকার।

ভানুমতীর খুব ভালো লাগে সুরঞ্জনকে। কথা বলার ভঙ্গীটিও সুরঞ্জনের বেশ। বেশ রসিক ছেলে।

লেখাপড়ায় বুঝি বি, এ, পাস। কোন্ একটা বীমা কোম্পানীতে মোটা মাইনের চাকরী করে। ভানুমতীর সঙ্গে খুবই আলাপ হয়েছিল সুরঞ্জনের। তারপর সবিতা মারা যাবার পর আর সুরঞ্জনের কোনো খবর পাননি ভানুমতী। ভেবেছিলেন হয়তো সুরঞ্জন এতদিনে আবার একটা বিয়ে করে আনন্দে সংসার করছে। সুরঞ্জন আর যে বিয়ে করেনি তা তিনি জানতেন না।

জানালেন সেবার অমিতার বিয়েতে মামার বাড়ীতে।

ভানুমতীর মামারবাড়ী শ্যামবাজারে। মামাদের অবস্থা খুব ভালো নয়। তাই ঘন ঘন উভয় পক্ষের যাতায়াতও নেই। কাজে কর্মে দেখা সাক্ষাৎ হয়।

তবে ভানুমতীকে মামারবাড়ির সবাই খাতির করেন। খাতির করেন তাকে বড়ো লোকের মেয়ে বলে। আর খাতির করে ভয়ে। ভানুমতী যেমন অহংকারী তেমনি বদ্‌রাগী।

কিন্তু যাই হোক। ভানুমতীর সঙ্গে আবার সুরঞ্জনের দেখা হল

বাড়িতে। প্রথমে সুরঞ্জনই দেখতে পায় ভানুমতীকে। ভানুমতী তখন নিজের আনীত বহু দামী অলংকারটি সযত্নে এবং যত্নের চেয়ে সগর্বে অমিতাকে পরিয়ে দিচ্ছিলেন। আশেপাশে অন্যান্য আত্মীয়পরিজনদের অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। কেউ কেউ আবার সপ্রশংস মন্তব্যও করেছিলেন। এতক্ষণে কনেকে মানালো।

—ওমা! এত দামী গয়না পরলে আর কাকে না মানায় দিদি? আমার টেঁপুর বিয়েতে ভানু অমনি কি একটা ভারী গয়না দিয়েছিল।

—দেবেই তো! ভানুর মন কত উঁচু।

—আহা, উঁচু মন বলেই তো ভগবান ওকেও ভরিয়ে দিয়েছেন। তাই তো আমরা বলাবলি করি গো, এমন যার মন তার অদেষ্টে এ দুঃখ্যু এলো কেন।

অর্থাৎ ভানুমতী বিধবা হলেন কেন।

একজন বর্ষীয়সী আত্মীয়া জিজ্ঞাসা করলেন—তা হ্যাঁ ভানু! আজকাল বুঝি এই রকম হার নতুন বের হয়েছে? কী হার বলে একে?

—এ হার নয় মাসিমা। কলার।

—কলার! অবাক! কত রকম নামই বেরুচ্ছে মা আজকাল। তা কত দাম পড়লো এর?

—সে আর তোমার জেনে কি হবে। তোমার মেয়ের কি যেন নাম।

—বাসন্তী।

—বাসন্তীর বিয়েতেও এমনি একটা দেওয়া যাবে।

—তা তো দিবিই বাছা। তা তো দিবিই। তোরা না দিলে কে দেবে? আমার বাসন্তীর বিয়েতে কিন্তুন যেতে হবে মা। পাড়াগাঁ বলে নাক সিঁটকোলে চলবে না।

—আমি আর কোন্ শহরের মেয়ে মাসিমা।

বাসন্তী কাছেই দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে চেয়ে ভানুমতী বললেন—কি রে তুই তো বেশ বড় সড় হয়েছিস। এবার তোর বিয়ে দিলেই হয়।

মাসিমা বললেন—বিয়ের ওর ঠিক হয়ে গেছে মা। সামনের ফাগুনে বোধ হয়—দুহাত এক করে দিতে পারবো। তোমরা দাঁড়িয়ে গরীব মাসিমাকে উদ্ধার করে দিও বাছা।

ঠিক এমনি সময় সুরঞ্জন এসে সামনে দাঁড়ালো। তার সরস বাচন আর অঙ্গভঙ্গি সহকারে বললে—পেন্নাম হই দিদিমণি। গরীবের দিকে একটু নেক নজর দেন।

—আরে! সুরঞ্জন যে!

ভানুমতী সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকালেন।

সুরঞ্জন অদ্ভুত ভঙ্গি করে বললে—এজ্ঞে আমি।

ভানুমতী হেসে উঠলেন। সেই সঙ্গে অন্যান্যরাও।

সেবার যেন সুরঞ্জনকে বড্ড ভাল লাগলো ভানুমতীর। এক সপ্তাহ বিয়ে বাড়িতে ছিলেন। এই এক সপ্তাহের মধ্যে অন্তরঙ্গতা অত্যন্ত বেড়ে গেল।

সুরঞ্জন বলেছিল—দিদি কি এ অধীনকে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন?

—না ভাই, ভুলিনি।

ভানুমতী বলেছিলেন—মনে ঠিকই রেখেছি। তবে আমি ভেবেছিলুম তুমি হয়তো আবার সংসারী হয়েছ। বিয়ে থা' করেছ। দিদিকে তুমিই মনে রাখনি।

এক হাত জিভ কেটে মুখের বিচিত্র ভঙ্গী করে সুরঞ্জন বলেছিল—ছি ছি, তাও কি হয় দিদি! আপনাকে দেখার পর আর কি কোনো মেয়ে চোখে লাগে যে বিয়ে করে সংসার করবো?

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বড় বড় চোখে তাকায় সুরঞ্জন ভানুমতীর দিকে।

ভানুমতী হেসে ফেলেন

—কেন আমার কি দেখলে তুমি?

—না। দেখলুম আর কোথায় দিদি। তবে—

একটা হাস্যজনক ও অর্থদ্যোতক মুখভঙ্গি করলে সুরঞ্জন। কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই।

ভানুমতীর বুকের মধ্যে যেন কিসের একটা দোলা লাগলো। মনের মধ্যে সুপ্ত কামনা আবার যেন আস্তে আস্তে জেগে উঠতে লাগলো। মুখখানা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল তাঁর। তিনি সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন আর কোনো কথা না বলেই।

চলে গিয়েছিলেন সম্ভবতঃ নিজের চিত্তকে শাসন করতে। কিন্তু পারেননি।

কিছুক্ষণ পরেই আবার সুরঞ্জন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো:

—দিদি আমার উপর কি রেগে গেলেন?

ভানুমতী কোন উত্তর দিলেন না। গম্ভীর হয়ে রইলেন।

—দিদি!

আরো একটু এগিয়ে এলো সুরঞ্জন।

ভানুমতী ভ্রূকুটি করলেন। যেন বোঝাতে চাইলেন, তিনি সুরঞ্জনের ইয়ার্কির প্রশ্রয় দিতে নারাজ।

—আমি কি কোনো অন্যায় করেছি দিদি?

এইবার ভানুমতী কথা বললেন। বললেন—নিজের মনেই ভেবে দেখ, অন্যায় করেছ কিনা। যেখানে দাঁড়িয়ে ভানুমতী সুরঞ্জনের সঙ্গে কথা বলছিলেন সেখানে তখন কেউ ছিল না। সবাই বিয়ে বাড়ির নানা কাজে নানা দিকে ব্যস্ত। তাদের দিকে লক্ষ্য করার জন্যে সেখানে কেউ ছিল না। এমনি একটু নির্জনতা বোধ হয় মনে মনে কামনা করেছিলেন

ভানুমতী। নিজের মনের সামনাসামনি একবার বসবার ইচ্ছা হচ্ছিল তাঁর। কিন্তু সে ফুরসত মিলল না। সুরঞ্জন এসে পড়লো।

সুরঞ্জন যেন ছায়ার মতো তাঁর পেছন পেছন ঘুরছে। বিয়ে বাড়ির অনেকের এটা চোখে পড়ছে। দু'য়েকজন কটাক্ষও করেছে। কেউ কেউ চাপা মন্তব্যও করেছে। তবে ভানুমতীর সামনে কোনো কথা বলার সাহস কারো নেই। তা ছাড়া ভানুমতী কাকেও গ্রাহ্যও করে না। ভানুমতী তাকিয়ে আছেন সুরঞ্জনে দিকে। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে স্থির হয়ে।

সুরঞ্জন বললে—কী অন্যায় করলাম বুঝিয়ে দিন।

—আমার বোঝাবার দরকার নেই। কিন্তু কোনো মহিলার সঙ্গে কথা বলতে গেলে তার সম্মান রেখে বলা উচিত।

—আমি তো আপনার কোনো অসম্মান করিনি দিদি।

—করেছ। সকলের সামনে তুমি অসভ্য ইয়ার্কি করেছ আমার সঙ্গে

একটু থেমে ভানুমতী বললেন—তুমি ভুলে যেয়ো না, আমি সম্পর্কে তোমার গুরুজন।

—ক্ষমা করুন দিদি।

হঠাৎ সুরঞ্জন নীচু হয়ে তার পায়ে হাত রাখলে।

—আমি অতটা তলিয়ে ভাবিনি দিদি।

সুরঞ্জনের স্পর্শে পেয়েই ভানুমতী শিউরে উঠলেন। তাড়াতাড়ি দু'পা পিছিয়ে গিয়ে নীচু হয়ে তার হাত দুটো চেপে ধরলেন।

—কি করছ, ছিঃ। পায়ে হাত দেয় না।

—না। আগে বলুন, আমার ওপর আপনার রাগ নেই।

—আরে। কি আশ্চর্য। ওঠো না। লোকে দেখলে কি বলবে ?

—বলুক। আগে রাগ নেই বলুন।

—না, নেই। তুমি ওঠো :

হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালো সুরঞ্জন।

ভানুমতী তার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন। মুখেও হাসলেন মনেও সেই হাসির পরশ। সুরঞ্জন তাকে আকর্ষণ করেছে। ভয়ংকর ভাবে আকর্ষণ করছে। সে বিপুল আকর্ষণের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অন্য উপায় দেখতে পেলেন না তিনি.

দীর্ঘকাল মন তার উপবাসী। সেই স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই প্রায় মন তার ঘুমিয়েছিল। সুরঞ্জন তার সেই ঘুমন্ত মনকে জাগিয়ে তুললে। তার মনে আবার ক্ষুধার সৃষ্টি করলে। তিনি আস্তে আস্তে এগিয়ে চললেন সুরঞ্জনের দিকে।

সন্তানবতী বিধবা ভানুমতীর পুনরায় পদস্খলন হ'ল। কোনো মতেই নিজেকে রক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব হ'ল না।

বিবাহবাড়ির উৎসবনান্দ থেমে যেতে ভানুমতীর বাড়ি ফিরে যাবার কথা। কিন্তু বাধা দিলে সুরঞ্জন।

—না দিদি, তা হবে না। আমার বাড়ীতে একবার পায়ের ধুলো দিতেই হবে।

ভানুমতী হাসলেন। কৃত্রিম অনিচ্ছার ভাব প্রকাশ করলেন।

—এবার থাক ভাই। অন্য সময় আসবো।

—না, তা হবে না। এবারেই যেতে হবে।

—অসুস্থ বাবা বাড়িতে আছেন। আমার বাচ্চা ছেলে ফেলে এসেছি। আর আমার দেরী করা চলে না যে ভাই।

—খুব চলে। একটা দিনে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। আপনি গেলে আমার মা ভারি খুশী হবেন।

—তোমার মা কি আমাকে চেনেন ?

—আপনার অনেক কথাই যে তাঁকে বলেছি দিদি। না না, সত্যি যেতেই হবে আপনাকে। আমি কোনো ওজর শুনবো না।

অগত্যা যেতেই হল ভানুমতীকে। বালিগঞ্জে একটি ছোট্ট বাড়ি সুরঞ্জনের। সেখানে গেলেন ভানুমতী।

আদর আপ্যায়নের অন্ত নেই।

এক সময় ভানুমতী জিজ্ঞাসা করলে সুরঞ্জনকে। জিজ্ঞাসা করলেন —আচ্ছা সুরঞ্জন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো? সত্যি কথা বলবে?

—নিশ্চয়ই। আপনার কাছে কি মিথ্যা বলতে পারি।

—তুমি আর বিয়ে করলে না কেন? তোমার মা কত দুঃখ করছিলেন।

—মার কথা ছেড়ে দিন।

—আচ্ছা, তা না হয় ছাড়লুম। কিন্তু কেনই বা তুমি বিয়ে করলে না?

সুরঞ্জন একটু চুপ করে রইলো তারপর ভানুমতার দিকে চেয়ে অদ্ভুত একটু হাসলো।

ভানুমতীও হাসলেন তার অনুরূপ হাসি।

—কি? চুপ করে রইলে যে? বলো?

—বলবো কি দিদি! বললে আপনি বিশ্বাস করবেন কি?

—করবো। তুমি বলো, লক্ষ্মীটি।

অকস্মাৎ কি যে হ'ল—ভানুমতী তার একটা হাত ধরলেন ঝপ করে।

—বলো?

সুরঞ্জন আবিষ্ট চোখ দুটি তার মুখের ওপর রাখলো। তারপর সেও তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলে। নিয়ে তার হাতে স্বল্প চাপ দিতে দিতে আস্তে আস্তে বললে—অপরাধ নেবেন না কিন্তু।

—না।

—আপনার জন্যে।

—আমার জন্যে!

চমকে উঠলেন ভানুমতী। কথাটা কিন্তু ভারি মনঃপুত হ'ল তাঁর। তিনি আরও নিবিড় হয়ে বসলেন।

—ছি। ওকথা বলতে নেই। আমি বিধবা মানুষ তাছাড়া আমার ছেলে রয়েছে।

—থাক। আপনি বিধবা আর আমিও তো বিপত্নীক।

—দূর! অসভ্য, ফাজিল!

ভানুমতী তার গালটা টিপে দিলেন।

সুরঞ্জন বললে—সত্যি দিদি, কী শুভলগ্নে যে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

হঠাৎ আপনি থেকে তুমিতে নেমে গেল সুরঞ্জন। ভানুমতীর হাতে আরো জোরে চাপ দিলে।

—আমার সমস্ত মনখানা—

—আহঃ! তোষামোদ করা হচ্ছে, না?

—মাইরি বলছি। জীবনে আমি অনেক মেয়ে দেখেছি। অনেক রূপসী মেয়ে। কিন্তু এমন আর দেখিনি। এমন করে আমার মনকে পাগল করেও কেউ দেয়নি।

—তাই বুঝি কোনো খোঁজও নিতে না?

—খোঁজ নিতুম ঠিকই। কিন্তু সাহসে কুলতো না?

—কেমন সাহস হতো না।

—কে কি বলবে। পাড়াগাঁ জায়গা। তা ছাড়া এত ভালো করে আলাপ তো হয়নি আগে। তাই সাহস হতো না।

—বেশ। এখন সাহস হয়েছে তো। তাহলে চল কালকে আমার সঙ্গে কালীগড়ে।

—রাজী আছি।

সেই কথা অনুযায়ী পরের দিন ভানুমতী যখন কালীগড়ে ফিরলেন সঙ্গে সুরঞ্জন।

সেবার সুরঞ্জন প্রায় আট দশ দিন কালীগড়ে ছিল।

রাজনারায়ণ ভুরু কুঁচকে ভানুমতীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি ব্যাপার? সুরঞ্জন জামাই যে হঠাৎ।

সহাস্যে ভানুমতী উত্তর দেন—বড় মিষ্টি স্বভাব বাবা, সুরঞ্জনের। এবার আমাকে ওদের বাড়ী নিয়ে গিয়েছিল। সে ওর মার আর ওর কী যত্ন তোমায় বলবো কি বাবা।

—বটে। তা সুরঞ্জন আর বিয়ে থাও করেনি?

—না।

—কেন?

—তা জানি না। আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম। বলে ভালো লাগে না।

—ভালো লাগে না! সে আবার কি? ওর মা কিছু বলেন না?

—তিনি তো রাতদিন বলছেন। আমার কাছেও কত দুঃখ করলেন।

—কি জানি। আজকালকার ছেলেমেয়েদের ব্যাপার বুঝতে পারি না। কী যে চায় তারা।

ঠোঁট দুটো উলটে মুখের একটা বিচিত্র ভঙ্গী করেছিলেন রাজনারায়ণ।

ভানুমতী বলেছিলেন—না, সুরঞ্জনের স্বভাব চরিত্র খুব ভালো। সকলেই প্রশংসা করে।

—তা তো বটেই। আমিও তো ভালো বলেই জানি। সবিতার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ তো আমিই করেছিলুম। বিয়েটাও বলতে গেলে আমি খরচপত্তর করে—তখন রমনীর অবস্থা তো তত ভাল ছিল না। আমাকে এসে ধরলে—

একটা নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন রাজনারায়ণ।

ভানুমতীও একটা চাপা নিঃশ্বাস মোচন করেন।

রাজনারায়ণ জিজ্ঞাসা করেন—উনি এখানে দুদিন থাকবেন?

ভানুমতী মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন—আমাদের গ্রাম ওর খুব ভালো লেগেছে। বলছে ছুটিটা কাটিয়ে যাবে।

—ভালো। জামাই মানুষ, অযত্ন যেন না হয় দেখো।

আর কোনো কথা বলেননি রাজনারায়ণ।

সুরঞ্জন অত্যন্ত রসিক এবং মিশুক। আদিত্য অল্পক্ষণের মধ্যেই সুরঞ্জনের রীতিমত বশীভূত হয়ে পড়ে। আদিত্য আর ছাড়তে চায় না তাকে। খালি বলে—মেশোমশাই একটা গল্প বলুন।

মেশোমশাইও গল্প বলেন।

এমনি করেই আট দশটা দিন কেটে গেল। কিন্তু শুধুই কি কেটে গেল? আর কিছু কি নয়? ভানুমতীর জীবনে সেই আট দশটা দিন আনন্দের জোয়ার বহন করে আনেনি কি?

ভাল লেগেছিল। সত্যিই ভালো লেগেছিল। জীবনের গোনা সেই কটা দিন। মেতে উঠেছিলেন ভানুমতী। বুঝি মনখানা তাঁর উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। সুরঞ্জন যেন একটা রুদ্ধ উৎসের মুখ খুলে দিয়েছিলেন। অগ্র পশ্চাৎ কোনো দিকে তাকাবার অবকাশ পান নি ভানুমতী। লুব্ধ পতঙ্গের মতো আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পরিণাম চিন্তা করেন নি।

কিন্তু তারপর? সারাদেহে যখন অগ্নি পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়লো, জ্বালা সর্বশরীরে, তখন চমকে উঠলেন ভানুমতী নিজের পানে তাকিয়ে। সর্বনাশ হয়ে গেছে তার। আর উপায় নেই। ভানুমতী তখন অন্তঃসত্ত্বা। অনন্দের পালা শেষ হয়ে লজ্জা আর বেদনার পালা এলো ভানুমতীর। প্রথম প্রথম অনেক চেষ্টা করলেন। সুরঞ্জন লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক ওষুধ এনে দিলে। কিন্তু সবই নিরর্থক হল। এদিকে দিনও ঘনিয়ে আসতে লাগলো। দু' মাস, চার মাস, ছ' মাস, আট মাস। আর উপায় রইলো

না। ভানুমতী অসুস্থ। ঘর থেকে বেরুতে পারেন না। কি হয়েছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। অথচ ডাক্তার দেখাবেন না।

রাজনারায়ণ চিন্তায় পড়লেন।

সেই সময় একদিন সুরঞ্জন এলো। এসে খুব চিন্তার ভাব দেখালে। তারপর রাজনারায়ণের সঙ্গে পরামর্শ করে যেন জোর করেই ভানুমতীকে কলকাতায় নিয়ে গেল। সেখানে ভাল ডাক্তার দেখাবে বলে।

কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সুরঞ্জন ভানুমতীকে একটা অন্য বাড়ী ভাড়া করে রাখলে। সেইখানেই যথাসময়ে ভানুমতী একটি কন্যা প্রসব করলেন। অপূর্ব সুন্দরী কন্যা।

সেবার প্রায় পাঁচ ছ' মাস কলকাতায় ছিলেন ভানুমতী। তারপর সেই শিশুকন্যার ভার সুরঞ্জনের উপর দিয়ে তিনি কাশীগড়ে ফিরে এলেন।

সুরঞ্জন বলে দিলে—এই অবাঞ্ছিত মেয়েটার জন্যে তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। এর ব্যবস্থা আমি করবো।

—মেরে ফেলো না যেন।

কেঁদে ফেলেছিলেন ভানুমতী।

—আরে না না, তা কি পারি?

সুরঞ্জন হাসতে হাসতে ভানুমতীর পিঠ চাপড়ে বলেছিল।

তারপর কতদিন কতকাল হয়ে গেল। সে মেয়ের আর কোন খবর জানেন না ভানুমতী। সে আছে কি নেই তাও জানেন না। শুনেছিলেন সুরঞ্জন তাকে নাকি কার কাছে রেখে এসেছে।

সুরঞ্জন বলেছে—সে ভালই আছে। তার জন্যে তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। ভাবেন না ভানুমতী। তবে মাঝে মাঝে মনটা উদাস হয়ে যায়। মনে পড়ে যায় নিজের অপকর্মের কথা আর সেই অপকর্মের ফলের কথা।

সংসারে কিছুই এক রকম থাকে না। অনুদিন অদল বদল চলেছেই। ভানুমতীও এখন বদলে গেছেন। সুরঞ্জনও আবার বিয়ে করে সংসার

করছে। ভানুমতীর সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্ক নেই। কি আশ্চর্য মানুষের মনের গতি।

ভাবনার কি শেষ আছে! কত ভাবনাই ভাবেন ভানুমতী। তবে ভাবনার রূপ বদলাচ্ছে। আগের ভাবনার সঙ্গে এখনকার ভাবনার কোন মিল নেই। তবে অনুতাপ আছে। হৃদয় জোড়া অনুতাপ। যৌবনের উন্মত্ততায় প্রবৃত্তির তাড়নায় যত কিছু করেছেন। যত অন্যায়, যত ব্যভিচার করেছেন সেজন্যে গভীর অনুতাপ আছে। আর আছে বেদনা।

ভানুমতী এখন কৈশোর-তারুণ্যের দ্বার উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণ হয়েছেন যৌবনের সীমারেখা। এখন তিনি প্রৌঢ়া। এখন তাঁর ছেলে আদিত্যনারায়ণ তরুণ যুবক। এখন শুধু তাকে ঘিরেই তার স্বপ্ন রচনা। নিজেকে নিয়ে স্বপ্নরচনার দিন অতীত হয়েছে।

আদিত্যনারায়ণ ভালো ছেলে। ভানুমতীর গর্ভে এমন সুচরিত্র সন্তান কল্পনা করা যায় না। আদিত্য সম্প্রতি বি, এ, পাশ করেছে। এবার এম, এ, পড়বে। আদিত্যের স্বভাব তার বাপের মতোই হয়েছে। কথা বলে কম, ভাবে বেশি। কি যে ভাবে তা সেই জানে। সে ভাবনার যেন শেষ নেই।

ভানুমতী জিজ্ঞাসা করেন—হ্যাঁ রে, আদু, কি অত ভাবিস তুই বল তো দিনরাত? আদিত্য হাসে। হেসে মায়ের মুখের দিকে তাকায়। কোনো জবাব দেয় না।

বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে আজকাল ভানুমতীর। এত বড় বাড়ি, লোকজন নেই। সারা বাড়িটা যেন খাঁ খাঁ করছে। বাগান বাড়িটার দিকে তো তাকানোই যায় না। অবশ্য আদিত্যর গাছপালার খুব শখ। তাই এখন জন দুই মালি রেখেছে বাগান করার কাজে।

বাগানটা বেশ পরিষ্কার হয়েছে। অনেক নতুন নতুন ফুলের গাছ বাগানের শোভা বর্ধন করছে। বাগান দেখতে এখন ভালোই হয়েছে। ভানুমতীর তো এখন দিনের অধিকাংশ সময় বাগানেই কাটে। আর কাটে পুকুরঘাটে বাগান বাড়িটার দিকে তাকিয়ে।

গান এখনো করেন ভানুমতী। তবে ছেলের সামনে গান করেন না, লজ্জা করে। যদিও আদিত্য বলে—মা তুমি অত ভালো গান করতে পারো—করো না কেন ?

—আর ভালো লাগে না।

—না, ভালো লাগে না! গান আবার ভালো লাগে না। দাদু বলতেন তোমার গলায় নাকি সরস্বতী বিরাজ করতেন আগে

খিল খিল করে হেসে ওঠেন ভানুমতী।

—তোর মাথা! তোর দাদু নিজেই একজন গান পাগলা ছিলেন।

—তাও দাদু বলেছেন। বলেছেন—গান হলে তিনি সংসার ভুলে যেতেন। দাদুর এই জমিদারীর অধিকাংশ টাকাই নাকি ওই গান-বাজনার পেছনে গেছে।

—তাই তো গেছে রে।

আদিত্য মায়ের কাছে সরে বসে জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁ মা, তখনকার কথা তোমার সব মনে আছে ?

—কেন থাকবে না।

—তাই বলছি। তখন বাড়িটা খুব জম জমাট ছিল না ? গান বাজনা—

ভানুমতী হাসেন। বড় বিষণ্ণ হাসি হাসেন। সমস্ত অতীতটা স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। কত হাসি, কত কান্নার স্মৃতি।

হঠাৎ আদিত্য জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁ মা, তোমাকে কে একজন গান শেখাতেন, মস্ত বড় ওস্তাদ! তাঁর গান শুনলে নাকি লোকে সংসারের কাজ কর্ম ভুলে যেত ?

—হ্যাঁ।

ভানুমতীর বুক নিঙড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস নির্গত হ'ল। বুকের ভেতরটা যেন কেমন পাক দিয়ে উঠলো।

আদিত্য বলে চলেছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলেছে।

—কি নাম মা তার? এখন কোথায় থাকেন তিনি। দাদুর কাছে শুনেছি তাঁকে নাকি কন্দর্পের মতো দেখতে। আর অগাধ পাণ্ডিত্য। ভানুমতীর মুখ দিয়ে কোনো কথা উচ্চারিত হ'ল না। শুধু মাথাটা নাড়লেন মাত্র। কিন্তু বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠছে খালি। মুহূর্তে মন ভেসে চলে গেছে সেই সুদূর অতীতে। সেই হারানো দিনের সন্ধানে। বাসুদেবের সেই সৌম্য সুন্দর মূর্তিখানা মনের পর্দায় জেগে ওঠে। মনের কোণে বেজে ওঠে বাসুদেবের অপূর্ব কণ্ঠের সুর।

কত যুগ, কত কালের সে কথা। তবু আজও স্পষ্ট সব মনে আছে। মনে আছে সেই প্রথম দিনের কথা। যেদিন কালীগড়ে প্রথম এলেন বাসুদেব। মনে আছে সেই প্রথম তাকে দেখেই চিত্ত সমুদ্রে কি তরঙ্গের দোলা লেগেছিল।

তারপর? তারপর?—

কিন্তু তারপর আর ভাবতে পারেন না তিনি। একটা অসহ্য যন্ত্রণা হয় বুকের মধ্যে। সেই একান্তভাবে উন্মত্ত চিত্তে চাওয়া এবং হারানোর অপরিসীম বেদনা আজো ভুলতে পারেন নি তিনি। ভুলতে পারেন নি সেই অপমানের জ্বালা। এখনো মনে পড়লে বুকের ভেতরটা রি রি করে ওঠে।

তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বাসুদেব। তার প্রেম, তার ভালোবাসা তার রূপ যৌবন, তার এই পৈতৃক ঐশ্বর্য সমস্তই পরম অবহেলায় পদাঘাত করে চলে গিয়েছিল সংগীত সাধক সেই বাসুদেব। উঃ! কি অপমান! কি নিদারুণ অবজ্ঞা!

ভানুমতী ভেবেছিলেন প্রতিশোধ নেবেন। চরম প্রতিশোধ। কিন্তু

কিছুতেই সম্ভব হয়নি। এমন কি, বাসুদেবের আর কোনো সংবাদও নিতে পারেন নি।

এখন বাসুদেব কোথায় আছেন? কেমন আছেন? আছেন কি নেই—কিছুই জানে না। এখনো কি তেমনি সুর-সাগরে নিমগ্ন হয়ে আছেন? এখনো কি সংযম আর নিষ্ঠার উপদেশ বিতরণ করছেন? : ভগবান জানেন।

বাসুদেব বলেছিলেন জীবনে তিনি বিবাহ করবেন না। সংসারী হবেন না। কামিনী আর কাঞ্চনের প্রতি তাঁর কোনো মোহ নেই। এ জীবনটা তিনি সংগীত সাধনায় ব্যয় করবেন।

ছাই করবেন! মনে মনে গর্জে ওঠে ভানুমতী। এতদিন হয়তো বিয়ে করে—

—কি হ'ল তোমার মা?

আদিত্য মায়ের গায়ে মৃদু ঠেলা দেয়। ভানুমতী চমকে ওঠেন। আদিত্য বলে—কি ভাবছ তুমি অত?

বিষণ্ণ হাসি হেসে ছেলের দিকে তাকান ভানুমতী। একটা নিঃশ্বাস মোচন করে বলেন—না, তেমন কিছু ভাবিনি তো।

—তবে চুপ করে আছ কেন?

—কি করবো?

ভানুমতী ছেলেকে সস্নেহে কাছে টেনে নেন

আদিত্য এখন ভানুমতীর সমস্ত জগৎ জুড়ে বিরাজ করছে। আদিত্যকে নিয়েই তিনি বেঁচে আছেন আজো। নইলে আর বাঁচতে সাধ নেই তাঁর। কত চাওয়া, কত পাওয়া, কত হারানোর ইতিহাস রচিত হয়ে গেছে তাঁর জীবনে। আর কোনো সাধ নেই। কেবল একটি সাধ। তাঁর আদিত্যকে সংসারী করে দেবার। আদিত্যের

বাবার প্রতি তিনি অনেক অবিচার করেছেন। অনেক অযত্ন, অনেক অত্যাচার! এবার আদিত্যকে নিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করবেন।

আদিত্য বড় ভালো ছেলে। বড় মিষ্টি স্বভাব। আদিত্যকে দেখতে ঠিক তার বাপের মতো। সুন্দর সুপুরুষ না হলেও দেখতে খারাপ নয়। রীতিমত চটক আছে। রংটা শ্যামও নয় গৌরও নয়—মাঝামাঝি। মুখ চোখ চমৎকার।

ভানুমতী বলেন—আদিত্য আমার হীরের আংটি। ওর সোজা-বাঁকায় দামের তারতম্য হয় না।

উপস্থিত ভানুমতীর বাসনা হয়েছে আদিত্যের বিবাহ দেবার। একা একা এত বড় বাড়িতে আর ভালো লাগে না তার। আদিত্যের বিয়ে দিয়ে বউ আনতে পারলে তবু সংসারে একটা তার দোসর হবে। আত্মীয় পরিজন প্রতিবেশী সকলেই সেই কথা বলছে। তাছাড়া তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়ে দেবার প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেন। বাইশ তেইশ বছর বয়স হল, আর দেরি করা উচিত নয়।

নিজেকে চেনেন ভানুমতী। নিজের দুর্বলতা তিনি জানেন। যৌবনের সেই উত্তপ্ত কামনায় কথা আজো তাঁর মনে আছে। সুতরাং নিজের সেই চারিত্রিক দুর্বলতা যদি ছেলের মধ্যে সংক্রামিত হয়, সেই ভয়ে সর্বদাই তিনি আতঙ্কিত।

আদিত্যর এবার বিয়ে দেবেন ভানুমতী। টুকটুকে সুন্দরী একটি ঘর আলো করা বউ আনবেন। তাকে নিয়ে নতুন করে সংসার সাজাবেন। তাকে সাজাবেন, তাকে নিত্য নতুন পরাবেন। তাকে আদর করবেন, যত্ন করবেন, ভালো বাসবেন। কোথা দিয়ে দিন কেটে যাবে তিনি তা জানতেও পারবেন না।

নতুন দিনের নতুন স্বপ্ন।

—না না। ওসব চলবে না। বিয়ে ফিয়ে করা আমার দ্বারা হবে না। অবশেষে অনেক বলা কওয়া অনেক রাগারাগি করায় শেষে রাজী হয়েছে। মায়ের কথার অবাধ্য হতে পারে না, আদিত্য। মায়ের যখন শখ তখন আর উপায় কি! বিয়ে তাকে করতেই হবে। তবুও একটু আপত্তি তুলেছিল।

—এখুনি কেন মা! আগে এম, এ, পাশ করে নি—

—না বাবা, সে অনেক দেরি

ভানুমতী শিউরে উঠে বলেছিলেন বলেছিলেন—আমি আর এমন একা এত বড় বাড়িতে থাকিতে পারি না, বাবা।

আদিত্য সবিস্ময়ে বলেছিল—একা কেন?

—একা বৈকি বাবা! তুমি তো পড়াশোনার জন্যে বেশির ভাগ দিন কলকাতায় থাক। আমি এখানে কি নিয়ে—কাকে নিয়ে থাকি বলো? ভানুমতীর চোখ দুটো ছল ছল করে উঠেছিল।

—বাড়িতে লোক অবিশ্যি অনেক আছে। আত্মীয়রা রয়েছে। ঝি, চাকর, রাঁধুনি, দারোয়ান, মালী—সবই আছে। কিন্তু এদের নিয়ে কি আমার মন ভরে? তুই-ই বল?

—কিন্তু পড়াশোনা—

আদিত্য আমতা আমতা করে বলতে যায় কিছু। ভানুমতী বাধা দেন। তোর পড়াশোনার কোন ক্ষতি হবে না আর। আমার একটা দিন কাটাবার সঙ্গী এনে দে। এমন করে আর আমি থাকতে পারি না। মায়ের একটা সাধ তুই পূর্ণ কর বাবা। আর আমি কিছু চাই না। শরীরও তো ভালো না। কবে আছি, কবে নেই—আদিত্য মাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—ইশ! নেই বললেই হ'ল আর কি। তোমায় যেতে দিচ্ছে কে শুনি? আর যাবেই বা কোথায়?

—তোর বাবা যেখানে গেছেন।

—খবরদার বলছি মা। ভালো হবে না।

—তাহলে বিয়ে করবি বল্‌?

—আমি কি করবো না বলেছি। তোমার কথার অবাধ্য আমি হতে পারি?

—সে তো আমি জানি বাবা! তাই তো বলছি।

আনন্দে ভানুমতীও ছেলেকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তার ললাটে গণ্ডে অসংখ্য চুম্বন এঁকে দিয়েছিলেন।

তারপর থেকে মেয়ে খোঁজার কাজে লোক লাগিয়েছেন ভানুমতী। ঘটকী এবং ঘটক। তাছাড়া চেনা শোনা যাকে দেখছেন তাকেই বলেছেন—একটি সুন্দরী মেয়ে আমায় দেখে দিন না। ছেলের বিয়ে দেবো।

কত মেয়ের সন্ধানই ইতিমধ্যে এলো। কত সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে। বড়লোকের মেয়ে। গরীবের মেয়ে। গান জানা মেয়ে। সংসারে কাজ কর্ম জানা মেয়ে। কিন্তু ভানুমতীর কোন মেয়েই পছন্দ হ'ল না। সন্ধান পেলেই ভানুমতী নিজেই দেখাশোনা করেন। তারপর চিঠি লিখে জানিয়ে দেন—মেয়ে পছন্দ হয়নি।

কোনো মেয়ের বয়স বেশি। কোনো মেয়ের রংটা চাপা। কোনো মেয়ে বড্ড মোটা। কোনোটা আবার বেশি রোগা। কেউ লেখাপড়া জানে না। কেউ আবার বেশি জানে। ছেলের সঙ্গে মানাবে না। এ মেয়ের হাত নেই, ও মেয়ের চোখ ছোট, ওর গাল দুটো বড্ড ফুলো, ওর তেবড়া, কারো চুলের বাহার নেই, কারো মুখে বিদঘুটে দাগ। এমনি কত কি।

কিছুতেই আর মেয়ে পছন্দ হয় না ভানুমতীর। একটি মাত্র বউ হবে তাঁর, সেও যদি মনের মতো না হয় তো চলবে কেন?

এমনি মেয়ে দেখতে দেখতে আদিত্য এম, এ, পড়তে সুরু করলো। কিন্তু মেয়ে আর পছন্দ মত পাওয়া যাচ্ছে না। বড় খুঁতখুঁতে ভানুমতী।

আদিত্য মাঝে মাঝে মাকে বলে—কি হল মা? কতগুলো মেয়ে দেখলে?

—তা কি করবো বাপু। পছন্দ হয় না যে।

—পছন্দ তোমার হবেও না।

—না, হবে না। দেখবি তখন, এমন একটা বউ নিয়ে আসবো—

—কেমন বউ আনবে মা? পরী?

আদিত্য হাসে মায়ের দিকে চেয়ে চেয়ে।

ভানুমতী বলেন—তখন দেখবি—হ্যাঁ, মা আমার একটা বিয়ে দিয়েছে বটে। রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।

হো হো করে হেসে ওঠে আদিত্য। হাসতে হাসতে বলে—কিন্তু মা গো! পাঁচজনে কি বলছে জানো মা?

—কি বলছে?

—বলছে তোমার মনের মতো পাত্রী নাকি আজও জন্মায়নি। তবে কেষ্টনগরে যদি অর্ডার দাও—

—ফাজলামি করিসনি। লোকের আর কি! তারা বলবে না কেন। তাদের তো আর ঘর করতে হবে না। আমার ঘরের লক্ষ্মী আমি দেখে শুনে আনবো না তো কি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে আনবো? না তাদের চোখে দেখে আনবো? যত্তো সব—

আদিত্য বলে—না মা, অমন কাজ কোরো না। কারু কথায় তুমি কান দিয়ো না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার পছন্দ না হয় ততক্ষণ তোমার ঘরের বউ তুমি ঘরে এনো না। আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে লেখাপড়া করি।

—তার মানে?

—মানে আর কি মা! পছন্দ তোমার সহসা হবেও না, আমি বাঁধা পড়বো না। আমরা দুই মায়ে ছেলেয় যেমন আছি তেমন থাকবো। বলেই আদিত্য মায়ের গলাটা জড়িয়ে ধরে।

ভানুমতী তার হাত সরিয়ে দিতে গিয়ে বললে—ছাড়। ওরে লাগে আমার।

—লাগুক। শরীক আনছ মনে নেই?

—শরীক! সে আবার কি?

—শরীক বইকি! তোমার স্নেহের বউ এলে ভাগাভাগি হয়ে যাবে না?

—ও।

ভানুমতী হেসে ছেলের মস্তক চুম্বন করলেন।

—এতও জানিস বাছা! বলে শরীক!

হাসতে থাকেন ভানুমতী। স্বল্পক্ষণ পরে আপন মনেই বলতে থাকেন—মাগী কই আর তো খবর দিলে না।

—ওমা!

আদিত্য মায়ের মুখের পানে তাকিয়ে বলে—তুমি কি বিড় বিড় করছ?

আবার একটু হাসেন ভানুমতী। বলেন—বিড় বিড় করছি কি সাধে। বিশ্বাস করে মেয়ে লোকটাকে রাহাখরচ বলে দশটা টাকা দিলুম। ব্যস্! আর পাত্তা নেই!

—কাকে বিশ্বাস্ করে টাকা দিলে? কার পাত্তা নেই?

—একটা ঘটকী। বললে কি না তার সন্ধানে এমন মেয়ে আছে যার রূপের নাকি কোন তুলনা নেই। তেমনি গান বাজনা! সংসারের কাজেও সে মেয়ের জুড়ি মেলে না!

—বটে! এই বলে তোমায় ঠকিয়ে দশটা টাকা নিয়ে গেল?

—তাই তো গেল।

আদিত্য মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেলে বলে—ওগো মা, আমার মনে হয় তোমার ঘটকী কেষ্টনগরে গেছে। দশটা টাকা তুমি যা দিয়েছ তাই বায়না দিয়ে আসতে।

—তোর মুণ্ডু।

ভানুমতী হাসতে হাসতে অন্যত্র চলে যান। একটু পরেই আবার ফিরে আসেন। আদিত্য একখানা বই নিয়ে সবে মাত্র খুলতে যাচ্ছে। ভানুমতী এসে বললেন—এই দেখ, কেষ্টনগরের পুতুলের ছবি।

—আমায় আর ছবি দেখাতে হবে না মা ও তুমিই দেখো।

ভানুমতী বলেন—ফটোটা দেখিয়েই তো দশটা টাকা নিয়ে গেল। বললে সব খবর ভালো করে জেনে নিয়ে আসবে।

একটু থেমে বললেন—তা সত্যি আদু! যদি এই ছবির মতো মেয়ে দেখতে হয় তো সে পরমা সুন্দরী বলতে হবে।

—তা হবে হয়তো। কিন্তু মা ছবিতে তো গায়ের রং বোঝা যায় না।

—নারে বলেছে রং একেবারে দুধে আলতা গোলা!

আদিত্য মায়ের দিকে চেয়ে একটু হাসে। গর্বের হাসি। তারপর বলে—রং যার যতই হোক্‌, আমার মায়ের কাছে কাউকে দাঁড়াতে হচ্ছে না।

—না, হচ্ছে না।

ভানুমতী মুখ টিপে হাসতে যায় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় আর একজনের রঙের কথা। সে রঙের কাছে তার রং ম্লান। সে রং তার ওস্তাদ বাসুদেবের গায়ের রং। তেমন রং আজ পর্যন্ত আর কারো দেখেননি ভানুমতী।

—কি হল মা? হঠাৎ অমন গম্ভীর হয়ে গেলে কেন? তোমাকে বাপু গম্ভীর হলে মোটেই মানায় না। তোমার হাসিই ভালো।

ভানুমতী কোন কথা না বলে শুধু একটু হাসেন। হাসিটা বড়ই বিষণ্ণ। বড়ই ম্লান।

আদিত্য আর কোনো কথা বলে না। কেবল মায়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। মায়ের এই বিষণ্ণ হাসির অর্থ সে বুঝতে পারে না।

তবে এইটুকু বুঝতে পারে—মায়ের মনের কোথায় একটা গভীর বেদনা লুকিয়ে আছে। কিন্তু কি সে বেদনা।

সেদিন ঝির ঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। জানলার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন ভানুমতী।

তখন বেলা আন্দাজ এগারোটা হবে। সবেমাত্র স্নান সেরেছেন তিনি। সেরে জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন।

সার্সির কাঁচে বৃষ্টির জল ফোঁটা ফোঁটা করে পড়ছে। যেন কাঁচটা ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছে। তারপর গড়িয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁচের বুকে জলের আঘাত লক্ষ্য করছিলেন ভানুমতী। লক্ষ্য করছিলেন—বিন্দু বিন্দু সেই জল কেমন আস্তে আস্তে গড়িয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে।

বৃষ্টি থেমে গেলে কাঁচের গায়ে যে জলের দাগ থাকবে, সে দাগ মুছে ফেললে মিলিয়ে যাবে। আর এর চিহ্নও থাকবে না।

কিন্তু মনের দাগ? জীবনের চলতি পথে সংসারের মেদুর আকাশ যে বৃষ্টি ঝরায়—মনের পরকলায় তার যে দাগ সৃষ্টি হয়—সে দাগ কি ইহজীবনে কোনোদিন মেলায়? যতই মোছা যাক, সে দাগ মেলায় না জীবনান্ত না হওয়া পর্যন্ত। শুধু জোর করে ভুলে থাকার চেষ্টা মুছে ফেলার ভাণ। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, বৃষ্টির দাগ কাঁচের গায়ে দেখছিলেন ভানুমতী আর মনকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন ফেলে আসা অতীতের অন্ধকারে। একটি পরিচারিকা পেছনে দাঁড়িয়ে, তার সিক্ত কেশের পরিচর্যা করছিল।

কিছুক্ষণ এমনি নীরবতায় অতিবাহিত হলো।

সহসা সে নীরবতা ভঙ্গ হ'ল পরিচারিকার কথায়।

—ওমা! কী কাণ্ড গো!

চমকে উঠে তার দিকে ফিরে তাকালেন ভানুমতী।

সে বললে—কত পাকা চুল গো মা তোমার মাথায়।

হেসে ফেলেন ভানুমতী।

—আমার কি বয়েস হয়নি, দামিনী ?

—তুমি থামো বাছা ! কি বয়েস হয়েছে গা তোমার ? সেদিনের মেয়ে তুমি। কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি তোমায়।

—তা করেছ' কিন্তু তাই বলে কি আমার বয়েস বাড়বে না। আজ বাদে কাল আমার ছেলের বউ আসবে। তারপর—

তারপর কি হবে শোনবার মতো ধৈর্য রইলো না দামিনীর। সে আনন্দে বিগলিত হয়ে, তার কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠলো—আহা, তাই হোক মা—তাই হোক। বাবা পঞ্চানন্দ মুখ তুলে চান ! তা, হ্যাঁ মা ! কথাবার্তা সব পাকা করে আসবো ?

—আজ আমি নিজে গিয়ে পাকা কথা কয়ে আসবো ?

—কখন যাবে ?

—খাওয়া দাওয়ার পর। তুমি আমার সঙ্গে যাবে নাকি দামিনী ?

—আমি ? কেন যাবোনি মা ! নে, গেলেই যাবো।

—বেশ, তাহলে তুই আর ভজুয়া আমার সঙ্গে চল। এখন ঘটকী মাগী এলেই হয়। সে আবার খাবে এখানে।

ভানুমতী কাঁচের শার্সি ভেদ করে দৃষ্টি বাইরে প্রসারিত করলেন। আসা-যাওয়ার পথ এখান থেকে দেখা যায়।

একটু ইতস্ততঃ করে দামিনী তার আসল বক্তব্যটি পেশ করলে। কি জন্যে ভানুমতীর ছেলে আদিত্যের বিয়েতে তার এত উৎসাহ, সেই কথাটি ভানুমতীর ভিজে চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে বলে ফেললে।

—কিন্তু মা, আমার কথাটি মনে আছে তো ?

—কি কথা গো ?

ভানুমতী তার দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞাসা করলেন।

দামিনী বললে—দাদাবাবুর বিয়েতে আমায় যা দেবে বলেছ—

—হার ? নিশ্চয় দেবো। তুমি ঠাকুরকে ডাক, যেন ঐ সম্বন্ধ না ভাঙে। তোমাকে পাঁচ ভরির সোনার হার দেবো। আর তোমার নাতনির বিয়ের সব খরচা দেবো।

—দেবে বইকি মা। দেবে বইকি! তুমি না দিলে গরীব দামিনীকে কে দেবে? এ সম্বন্ধ তোমার ভাঙবেনি মা। দেখো, ঠাকুর ঠিক যোগাযোগ করে দেবে।

—তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। তা দামিনী আর দেরী কোর না। সব গুছিয়ে-গাছিয়ে নাওগে। দিন দুই কলকাতায় থাকতে হবে তো। সেই বুঝে সব গুছিয়ে নিও যেন।

—আচ্ছা মা।

দামিনী ব্যস্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ভানুমতী তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

ভানুমতীকে ঠকায়নি ঘটকী। দশটা টাকা নিয়ে গিয়েছিল—ভানুমতীর মতে একশো টাকার কাজ করে এসেছে সে। পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সব খবরাখবর নিয়ে এসেছে। এসে ভানুমতীকে একে একে সব বলছে।

শুনতে শুনতে ভানুমতী যেন বোবা বেনে গিয়েছিল। একটা অসহ্য বেদনা বুকের মধ্যে যেন পাক খেয়ে খেয়ে উঠছিল। প্রথমে বিশ্বাস হয়নি তার। তারপর সব শুনে আর বিশ্বাস না করে উপায় রইলো না।

ঘটকী বললে—মেয়ের যে ছবিখানা তোমায় দিয়েছি মা, তার সঙ্গে মেয়ের রূপ মিলিয়ে নিও।

ভানুমতী জিজ্ঞাসা করলেন—ভবানীপুরে না কোথায় যেন বাড়ি বললে মেয়ের ?

—ভবানীপুরে।

—নিজেদের বাড়ি ?

—নিজেদের বইকি ।

—মেয়ের বাপ মা আছেন ?

—মা নেই, বাপ আছেন ।

—মা নেই ? তাহলে তো শ্বশুরবাড়ি গেলে ছেলের যত্ন হবে না ! মুশকিল হ'ল যে। একটু চিন্তায় পড়লেন ভানুমতী। ভুরুটা কুঁচকে গেল তাঁর। জিহ্বা আর তালুর সংযোগে একটা বিচিত্র শব্দ করে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরে ভাবতে লাগলেন।

ঘটকী বললে—যত্ন হবে গো—যত্ন হবে। বাপের একমাত্র সন্তান ওই মেয়ে। বাপের বড় আদরের মেয়ে। বিষয়-আশয় যা আছে সবই তো ওই মেয়েই পাবে। যত্ন হবে না বলছ কি গো। তাছাড়া অমন মেয়ে তুমি পাবে কোথায় মা ? হাজারে অমন মেয়ে একটা মেলে কি না সন্দেহ ! সে রূপের কি তুলনা আছে মা ? তুলনা নেই। তার ওপর গুণ। বি, এ, পাশের পড়া পড়েছে। গান-বাজনায় মেয়ের চারদিকে কত নাম। খবরের কাগজে ছবি বেরোয়। সে গান একবার শুনলে আর ভুলতে পারবে না। তেমনি আবার সংসারের এমন কাজ নেই যা সে মেয়ে জানে না। এমন মেয়ে তুমি পাবে কোথায় মা ? শকুন্তলা ! যেমন নাম—দেখতেও তেমনি।

—তা বটে !

ভানুমতী জিজ্ঞাসা করেন—মেয়ের বাপ কি করেন ?

—মেয়ের বাবা ! কেন বললুম যে, মস্ত ওস্তাদ গাইয়ে। হাজার টাকার কম কোথাও গান করতে যাননি তিনি।

ভুরু কোঁচকালেন ভানুমতী।

—কি নাম তার ?

—বাসুদেব মিশ্র।

শিউরে উঠলেন ভানুমতী। ভয়ংকর শিউরে উঠলেন। একটা

বিষাক্ত ভুজঙ্গ যেন তার বুকের মধ্যস্থলে দংশন করলে। যন্ত্রণায় বেঁকে পড়েন তিনি। মুখখানা মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল।

ঘটকী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি হল গো মা তোমার? অমন করছ কেন? অসুখ করেছে নাকি?

ভানুমতী মাথা নাড়লেন। হাত তুলে তাকে থামতে ইংগিত করলেন।

স্বল্পক্ষণ পরে একটু সামলে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস আস্তে আস্তে পরিত্যাগ করলেন। ঘটকী স্থির হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছে। ভানুমতী অদ্ভুত একটু হাসলেন। বললেন—হঠাৎ শরীরটা কেমন করে উঠলো।

—তাই বলো বাছা! আমার ভয় ধরে গেছলো।

আবার একটু হাসলেন ভানুমতী। ইতি মধ্যেই তিনি নিজেকে সংযত করে নিয়েছেন। মনটা তার কঠিন হয়ে উঠেছে।

এতদিনে—এই দীর্ঘকাল যে সংকল্প তার মনের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেটা আবার হঠাৎ আজ জেগে উঠলো। মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। প্রতিশোধ নিতে হবে। অতীতের সমস্ত কথাই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল ভানুমতীর। মনে পড়ে গেল ওস্তাদ বাসুদেবকে।

মনে পড়ে গেল বাসুদেবের প্রতি নিজের আচরণ।

মনে পড়ে গেল বাসুদেবের সেই কঠিন প্রত্যাখ্যান। অভাবনীয় রূঢ়তা। বাসুদেবের সেই উপদেশ এখনো ভোলেননি ভানুমতী। সংযম আর নিষ্ঠার উপদেশ।

ভানুমতী মনে মনে গর্জে উঠলেন—মিথ্যাবাদী। প্রবঞ্চক।

হ্যাঁ, ভানুমতীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছেন বাসুদেব। বলেছিলেন, জীবনে তিনি কোনোদিন বিবাহ করবেন না। সংসারের বন্ধন কোনোদিন স্বীকার করবেন না।

ভুলতে পারেননি ভানুমতী। ভুলতে পারেননি তাঁর সেই কাতরতা। তিনি পায়ে ধরে বাসুদেবকে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁকে গ্রহণ করার

জন্যে। বাসুদেব অস্বীকার করেছিলেন। রাজনারায়ণের অনুরোধ উপরোধেও কর্ণপাত করেননি। সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির বিনিময়েও বাসুদেব ভানুমতীকে গ্রহণ করতে চাননি।

বলেছিলেন, বিবাহ করার রুচি নেই তাঁর। তিনি সন্ন্যাসী, সংগীত সাধনায় জীবন অতিবাহিত করবেন।

ভানুমতী দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করলেন —মিথ্যাবাদী!

ঘটকী চমকে উঠলো।—ওমা! মিথ্যাবাদী কেন গা? বিশ্বাস না হয় তুমি নিজের চোখেই দেখে এসো না গিয়ে।

—না না। তোমাকে বলিনি।

ভানুমতী বললেন—একটা কথা মনে পড়ে গেল তাই! তা হ্যাঁগা ঘটকী! মেয়ের বাবা বুঝি শুধু ওই গান-বাজনাই করেন?

—তাই তো শুনলুম।

—বাপের কাছেই বোধহয় মেয়ে গান শিখেছে?

—তাছাড়া আর কি। বাপ শুনি মেয়ে-অন্ত প্রাণ।

—তুমি ভদ্রলোককে দেখেছ? মানে মেয়ের বাবাকে?

—কেন দেখবো না।

—কি রকম দেখতে তাঁকে বলতো?

ঘটকী একটু ফিক্ করে হেসে ফেললে।

—তোমার এক কথা মা। অমন মেয়ের বাপ কখনো দেখতে খারাপ হয়? ঠিক যেন ঋষির মতো দেখতে। মেয়ের চাইতেও যেন বাপকে আরো সোন্দর দেখতে।

—হুঃ।

আবার খানিক চুপ করে থেকে ভানুমতী বললেন—তা কথাবার্তা কিছু হয়েছে?

—কথাবার্তা তো তুমি নিজে গিয়ে বলবে বললে। আর বাপু যা করবার করে ফেল। দেরি করো না। বড্ড তাড়া দিচ্ছে।

—তাড়া আমারও কম নয়। তাহলে এক কাজ করো। কাল কি পরশু আমাকে নিয়ে চলো। কথাবার্তা পাকা করে আসি। তোমার সঙ্গে তো কর্তার কোনো কথাবার্তা হয়নি ?

—না। বাড়িতে এক বুড়ি ঝি আছে গিন্নীর মতো। সেই কথা বলেছে। শুনলুম কর্তাও নাকি তাকে মায়ের মতো মান্য করে।

সবই মিলে যাচ্ছে, ভানুমতী দাঁতে ঠোঁট চেপে ভাবতে লাগলেন।

ভাবলেন, মন্দ হবে না। বাসুদেবের মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে। তিনি ছেলের মা—মেয়ে দেখতে যাবেন। মেয়ে দেখতে যাবেন বাসুদেবের বাড়িতে—বাসুদেবের মেয়েকে। গম্ভীর হয়ে বাসুদেবের সঙ্গে তিনি ছেলের বিয়ের আলোচনা করবেন। বলবেন—আমাদের একটা শর্ত আছে। আমাদের পারিবারিক শর্ত। বিয়ের পর মেয়েকে আর বাপের বাড়ি পাঠানো হবে না। এমন কি সন্তান না হওয়া পর্যন্ত বাপের কুলের কারো সঙ্গে দেখাও করতে দেওয়া হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, না, তা বলা চলবে না। কারণ বাসুদেব তাদের বাড়ির খবর সব জানেন। তার চাইতে তিনি বাসুদেবের কন্যার মাতৃকুলের সন্ধান জানতে চাইবেন। এবং এতটুকু গলদ কোথাও পেলে —

কিংবা আর এক কাজ করতে পারেন ভানুমতী—কন্যার মায়ের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন।

সন্দেহ করতে আর দোষ কি! বাসুদেবেরই যে মেয়ে শকুন্তলা তার কি কোনো প্রমাণ দিতে পারেন বাসুদেব ?

একটা কঠিন হাসি ফুটে উঠলো ভানুমতীর মুখে।

প্রতিশোধ! আঘাত! অপমান!

বিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়তো তিনি বাসুদেবের মেয়ে ওই শকুন্তলার সঙ্গে দেবেন না তাঁর ছেলের। পাকাপাকি করেও ভেঙে দেবেন। বাসুদেবের

মেয়েকে তিনি কিছুতেই ঘরে স্থান দেবেন না। বাসুদেব তাঁর জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছেন। এইবার তিনি তার প্রতিশোধ নেবেন। কি মিথ্যাবাদী লোক! বিবাহ করবে না বলে শেষে আবার বিবাহ করেছে! কেন ভানুমতী কি তাঁর যোগ্য ছিলেন না? ভানুমতী কি অসুন্দরী ছিলেন? ভানুমতী কি যৌবনবতী ছিলেন না? ভানুমতীর প্রেম কি প্রেম নয়?

হঠাৎ একটি অতীত সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে যায় ভানুমতীর। তিনি পড়ে গিয়েছিলেন আর বাসুদেব তাঁকে—

বুকটার ভেতর একটা অসহ্য যন্ত্রণার ঢেউ উঠলো। ভানুমতী সজোরে আপন অধর দংশন করলেন।

প্রতিশোধ! প্রতিশোধ তাঁকে নিতেই হবে। সুযোগ এসেছে।

হোক সুন্দরী মেয়ে বাসুদেবের। তবু তিনি পাকাপাকি করেও সে মেয়েকে প্রত্যাখ্যান করবেন।

তবে তিনি যাবেন। বাসুদেবের বাড়ীতে যাবেন। বাসুদেবের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কৈফিয়ৎ চাইবেন—কেন বাসুদেব তাঁর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছেন? কেন তাঁর জীবনটাকে তিনি নষ্ট করে দিয়েছেন? কেন তাঁর প্রেমের, তাঁর যৌবনের আকাঙ্ক্ষার কোনো মূল্য তিনি দেননি? জিজ্ঞাসা করবেন—সংযমের নমুনা কি ওই কন্যা?

তারপর? তারপর যা হবার হবে। ছেলের বিয়ে ওখানে দিতেও পারেন নাও পারেন। দিলেও অনেক ভুগিয়ে তারপর। ভানুমতী সংকল্প স্থির করে ফেললেন। ঘটকীকে বলে দিলেন, আগামী কাল ঘটকী যেন আসে। তিনি কলকাতায় মেয়ে দেখতে যাবেন। কিন্তু ভানুমতী বুঝতে পারছেন—মেয়ে দেখার চাইতে বাসুদেবকে দেখার আগ্রহই যেন বেশি তাঁর।

ভানুমতী এলেন। অনেকদিন আগে একবার বাবার সঙ্গে এসেছিলেন, আবার আজ এলেন।

সেবার এসেছিলেন বাসুদেবের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করতে। বাসুদেবকে কালীগড়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

একটা কেমন তৃপ্তির স্পর্শ। আজ বহুকাল পরে বাসুদেবকে দেখতে পাবেন।

সারা পথ বাসুদেবের কথাই ভাবতে ভাবতে এসেছেন তিনি।

এখন বাসুদেব কেমন দেখতে হয়েছে কে জানে! এখন হয়তো ঘোর সংসারী! আচ্ছা তাঁকে দেখে বাসুদেব কি বলবেন? কি বলতে পারেন? চিনতে নিশ্চয় পারবেন।

এই রকম কত কথা, কত ভাবনা ভাবতে ভাবতে ভানুমতী বাসুদেব ওস্তাদের গৃহে এসে উপস্থিত হলেন। নিজের আভিজাত্য দেখাবার জন্যে একটা প্রকাণ্ড মোটরে করে বাসুদেবের গৃহদ্বারে এলেন।

তখন বৈকাল।

বাড়ির ভেতর থেকে একটা মিষ্টি সুর ভেসে আসছে। কে যেন হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে। সেই সঙ্গে তামপুরার আওয়াজ।

সামনের ক্ষুদ্র দরজাটা অতিক্রম করে ভানুমতী এগিয়ে গেলেন। গিয়ে ছুটি সোপান বেয়ে বার-বারান্দায় উঠলেন। উঠে কলিং বেলটা টিপতে যাবেন এমন সময় দরজাটা খুলে গেল।

ভানুমতী থমকে দাঁড়ালেন।

একটি অনিন্দ্যসুন্দরী মেয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে আসছিল। ভানুমতীকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো। চোখে-মুখে জিজ্ঞাসার ভাব নিয়ে ভানুমতীর দিকে তাকালো।

ভানুমতী অবাক চোখে চেয়ে আছেন মেয়েটির দিকে। এত রূপ এ যে স্বর্গের অপ্সরী!

দামিনী দাসী ভানুমতীর ঠিক পেছনেই ছিল। সে বলে উঠলো, ওমা এ কে গা। ঠিক যেন তোমার মতোই দেখতে।

ভানুমতী তার দিকে ফিরে ভুরু কোঁচকালেন।

কিন্তু সে দমলো না।

বললে—সত্যি বলছি মা। তুমি বয়েসকালে ঠিক এমনি দেখতে ছিলে। রংটা অবিশ্যি তোমার একটু মাটো ছিল। আর—না, আর সবই প্রায় এক।

লজ্জায় মেয়েটি মাথা নীচু করলে।

ভানুমতী জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম শকুন্তলা ?

—হ্যাঁ। সলজ্জে উত্তর দিল মেয়েটি।

—তোমার বাবা বাড়ীতে আছেন ?

—আছেন। আপনারা ভেতরে আসুন।

মেয়েটি তাঁদের আহ্বান জানালে। এবং সঙ্গে করে ভেতরে নিয়ে গেল।

ভানুমতীর এ বাড়ি পরিচিত।

একবার এসেছিলেন। দিন দুই ছিলেন।

তাকিয়ে তাকিয়ে তিনি চারদিক দেখতে লাগলেন।

এক বৃদ্ধা একগাল হেসে ভানুমতীর সামনে এসে দাঁড়ালো।

—এসো মা এসো। তোমার পায়ের ধুলোয় আমাদের বাড়ি ধন্য হল।

ভানুমতী তার দিকে তাকালেন স্মিত মুখে।

—আপনি ?

—আমি ? আমি—একটা ঢোক গিললে বৃদ্ধা।

—আমি কেউ নয় মা। ওই মা মরা মেয়েটাকে আমিই মানুষ করেছি। ওরই জন্যে আমার কোথাও একদিন গিয়ে স্বস্তি নেই। ওর বাপ তো আপনভোলা মানুষ কোনোদিকে কোনো লক্ষ্য নেই। কোনো নজর নেই। কেবল গান আর বই। তাকে নিয়েও আমার এক জ্বালা।

—ও।

ভানুমতী বললেন—তাহলে ঘটকী তোমার কথাই বলেছিল ?

—তা হবে মা। কি বলেছে তা তো' জানি না। তবে আমার মেয়েটাকে তোমায় উদ্ধার করে দিতেই হবে মা। কত সম্বন্ধই এলো গেল, কিছুতেই আর বাসুর আমার মন ওঠে না। বলে মেয়ের বিয়ে দোব না। আচ্ছা তাই কি কখনো হয় গা মা। তুমিই বলো। আমি বলেছি এবার আর সম্বন্ধ হাত ছাড়া হতে দোব না। কুন্তলার বিয়ে যেমন করে হোক দোবই।

—কুন্তলা? ভানুমতী বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

বৃদ্ধা বললে—মেয়ের নাম গো মা। ওর বাবা ডাকে শকুন্তলা বলে। তা আমি বলি কি—শকুন্তলা নাম ভালো নয়। দুঃখ পেতে হয়। আমি তাই কুন্তলা বলে ডাকি।

ভানুমতী হাসলেন।

বৃদ্ধা বললে—মেয়েকে দেখলে তো মা! রূপের তুলনা নেই। আর গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না। তা তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন মা?

—হ্যাঁ বসি। কিন্তু তার আগে একবার মেয়ের বাবার সঙ্গে দেখা করা দরকার।

—করবে বইকি! দেখা করবে বইকি মা। এসো।

ভানুমতীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে যেতে বৃদ্ধা বললে—তার তো হুঁস খেয়াল নেই মা দিনরাত খালি গান আর গান। ওই যে বাসু এই দিকেই আসছে।

ইতিমধ্যেই শকুন্তলা গিয়ে বাসুদেবকে খবর দিয়েছিল, তাই বাসুদেব আসছিলেন ভানুমতীকে অভ্যর্থনা করতে।

ভানুমতী সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলেন। বাসুদেব ঠিক তেমনিই আছেন। কোনো পরিবর্তন হয়নি। কেবল চুলগুলোয় একটু পাক ধরেছে। আশ্চর্য! এত বয়স হল, অথচ—

ভানুমতীকে লোকে বলে চিরযৌবনা। উর্বশীর সঙ্গে তাঁর তুলনা করে। কিন্তু বাসুদেব যে তাঁকেও হারিয়ে দিলে।

বাসুদেব সহাস্যে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—আমার কি ভাগ্য ভাল যে তুমি এসেছ?

ভানুমতীর বুকের মধ্যে তোলপাড় করে উঠলো।

বাসুদেব বললেন—এসো।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভানুমতী তার পিছন পিছন এসে একটা ঘরে ঢুকলেন। বাসুদেবের নির্দেশে একটা চেয়ারে উপবেশন করলেন।

বাসুদেব তাঁর দিকে স্থির চোখে চেয়ে হাসতে লাগলেন।

—আমি জানতুম তুমি আসবে।

ভানুমতীর সব কথা যেন হারিয়ে গেল! কি করতে এসেছেন, কি বলতে এসেছেন, সব ভুলে গেলেন যেন।

বাসুদেব বললেন—একটু জলযোগ করো।

—না।

হঠাৎ যেন নিজের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে কঠিন হয়ে উঠলেন ভানুমতী। বাসুদেব তখনো শান্ত হাসি হাসছেন।

—না কেন? আমার বাড়িতে জলস্পর্শ করবে না?

—না।

—কেন?

—আপনি মিথ্যাবাদী।

—কি রকম? ভানুমতী অধর দংশন করলেন। তারপর বললেন—আপনি বিবাহ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—

—সে প্রতিজ্ঞা তো আমি ভঙ্গ করিনি।

—তবে কি মেয়েটা আসমান থেকে জন্মালো?

বাসুদেবের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। মুখটা দেখতে দেখতে কঠিন হয়ে উঠলো।

—ভানুমতী আমার মেয়ের নাম শকুন্তলা, মনে রেখো।

—তাতে কি হল?

—বিশেষ কিছুই নয়। মহাভারতে শকুন্তলা কার মেয়ে ছিল?

ভানুমতী ভুরু কুঞ্চিত করলেন।

বাসুদেব বললেন—আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের সম্বন্ধ করতে এসেছ তুমি। কিন্তু এ বিবাহ সম্ভব নয়।

—কেন? তাহলে আগেই জানালেন না কেন? আমাকে কষ্ট করে আসতে হতো না।

—তোমার আসাটা যে প্রয়োজন।

—কিসের প্রয়োজন?

—মেয়েটার বিবাহের ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে। আমি ওসব পারিও না বুঝিও না।

—আপনার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা আমি করতে যাবো কিসের জন্যে? আমার ছেলের সঙ্গে যখন—

—তোমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হতে পারে না শকুন্তলার।

—কেন পারে না? যে কারণে আমাকে একদিন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সেই কারণেই কি?

কেঁদে ফেলে ভানুমতী।

কি নিদারুণ অপমান!

—আমাকে কি আপনি বার বার [illegible] করে অপমান করবেন! কেন আমি কি এত অপরাধ করেছি আপনার কাছে?

বাসুদেব ভয়ংকর গম্ভীর হয়ে গেলেন। ললাটদেশ কুঞ্চিত হয়ে গেল তাঁর। মুহূর্তকাল তীক্ষ্ণ চোখে ভানুমতীর দিকে তাকিয়ে থেকে কঠিন স্বরে বললেন—অপরাধ আমার কাছে তুমি যত না করেছ ভানুমতী, তার

চাইতে অনেক বেশি করেছ তোমার নিজের কাছে। সমাজের কাছে, সন্তানদের কাছে, পরিজনদের কাছে। তোমার অনুতপ্ত হওয়া উচিত।

একটু থেমে বললেন—পৃথিবীর সকলের সঙ্গে ছলনা করতে পারো কিন্তু নিজের মনের সঙ্গে কিছুতেই পারবে না।

জলভরা চোখে ভানুমতী তার দিকে চেয়ে তার বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করছেন। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে চুপ করে বসে আছেন।

বাসুদেব হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যে আবার ফিরে এলেন।

কি একটা চিঠি—অত্যন্ত ময়লা কাগজের চিঠি হাতে করে তিনি ফিরলেন।

—ভানুমতী।

ভানুমতী তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন।

আর অপমান সহ্য হয় না। তিনি চলে যাবেন।

—উঠো না ভানুমতী। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—না। আমি আর আপনার কোনো কথা শুনতে চাইনা। আমি এখুনি চলে যাবো।

বাসুদেব খপ করে তাঁর একখানা হাত ধরে ফেললেন।

সঙ্গে সঙ্গে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন ভানুমতী।

—ছাড়ুন। আপনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি আমার হাত ধরছেন কোন অধিকারে?

—গুরুর অধিকারে গুরুর স্নেহে। তোমার পরিত্যক্ত সন্তানকে আমি পালন করেছি সেও ওই স্নেহ এবং অধিকারের বশে।

—আমার সন্তান! চিৎকরে উঠলেন ভানুমতী।

বাসুদেব বললেন—আমার কাছে লজ্জা পাবার কিছু নেই তোমার ভানুমতী। তোমার সব কিছুই আমি জানি। কিছুই গোপন নেই আমার কাছে। কিন্তু সে জীবন তুমি অতিক্রম করে এসেছ।

—কি বলতে চান আপনি? কম্পিত কলেবরে হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলেন ভানুমতী।

বাসুদেব বললেন—আজ থেকে বিশ বাইশ বছর আগে আমি একটা সংগীত অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে এলাহাবাদ যাচ্ছিলাম। ট্রেনের কামরায় একটা এক মাসের কি দু'মাসের শিশুকে কুড়িয়ে পাই! সে মেয়ের সঙ্গেই ছিল একটি চিঠি। ভ্রম বশেই হয়তো চিঠিটা ফেলে যাওয়া হয়েছিল।

আর দাঁড়াতে পারলেন না ভানুমতী। সেইখানেই মাটিতে বসে পড়লেন।

বাসুদেব বলে চলেছেন—এই সেই চিঠি। লেখাটা কি তোমার? সুরঞ্জন কি তোমার ভগ্নীপতি?

ভানুমতী লুটিয়ে পড়লেন বাসুদেবের পায়ের ওপর।

—সমাপ্ত—